দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা



ভারতের অন্তরঙ্গ বন্ধু ইজরায়েল
— পৃঃ ১৪

প্রধানমন্ত্রীর ইজরায়েল সফরের তাৎপর্য
— পৃঃ ১৬



৬৯ বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা।। ৩১ জুলাই ২০১৭।। ১৪ শ্রাবণ - ১৪২৪।। যুগাব্দ ৫১১৯।। website : www.eswastika.com ।।

কার স্বার্থে ৫০ বছর ধরে নকশালদের রাষ্ট্র বিরোধিতা?

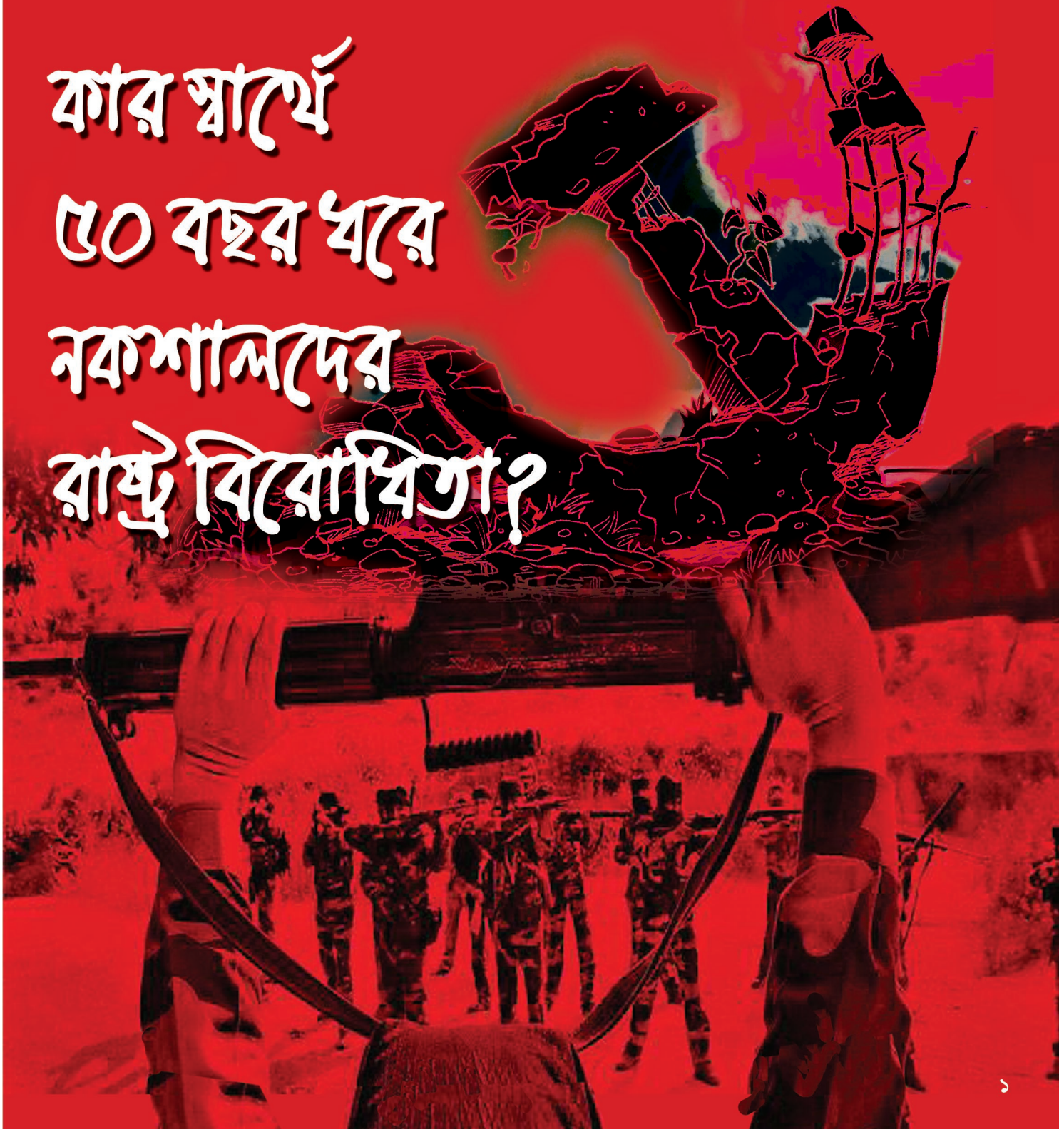

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৯ বর্ষ ৪৭ সংখ্যা, ১৪ শ্রাবণ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

৩১ জুলাই - ২০১৭, যুগাব্দ - ৫১১৯,

Website : www.eswastika.com



সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৮

খোলা চিঠি : মীরা হয়নি, গোপাল চাই

▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৯

পশ্চিমবঙ্গে লড়াইটা এখন বিজেপি বনাম তৃণমূলের

▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির অশনি সংকেত

▯ প্রণব দত্ত মজুমদার ▯ ১১

ভারতের অন্তরঙ্গ বন্ধু ইজরায়েল

▯ ইন্দ্রাণী বাগচি ▯ ১৪

প্রধানমন্ত্রীর ইজরায়েল সফরের তাৎপর্য

▯ মেঃ জেঃ কে কে গঙ্গোপাধ্যায় ▯ ১৬

পঞ্চাশ বছর ধরে নকশালরা কার স্বার্থে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ▯ সাধন কুমার পাল ▯ ১৯

মাওবাদীদের নতুনভাবে জেগে ওঠার নতুন অঞ্চল এম এম সি

▯ স্বপন দাস ▯ ২৩

মোদী সরকারের গৃহীত সংস্কারগুলি কোনো মায়াজাল নয়

▯ রাজীব কুমার ▯ ২৭

আমাদের ধর্ম আমাদের কর্ম, সংযমের অন্য নাম একাদশী

▯ নন্দলাল ভট্টাচার্য ▯ ৩১

মহাভারতের নারী : সুদেষ্ণা

▯ দেবপ্রসাদ মজুমদার ▯ ৩৩

অমর্ত্য সেন : ভাবের ঘরে চুরি

▯ কুণাল চট্টোপাধ্যায় ▯ ৩৫

নিয়মিত বিভাগ

এইসময়, সমাবেশ সমাচার : ২৪-২৬ ▯ চিঠিপত্র : ২৯ ▯

অঙ্গনা : ৩৪ ▯ সুস্বাস্থ্য: ৩৭ ▯ অন্যরকম : ৩৮ ▯

নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ▯ চিত্রকথা-শব্দরূপ : ৪২

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী

শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী তিথিতেই স্বস্তিকা-র শুভারম্ভ হয়েছিল। এই তিথিতেই এবছর স্বস্তিকার ৭০ বর্ষে পদার্পণ। দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন করে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠাই ছিল শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য। বর্তমান যুগে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের তাৎপর্য নিয়ে পর্যালোচনাই আগামী সংখ্যার আলোচ্য।

স্বাধীনতার ৭০ বছরকে কেন্দ্র করেই প্রকাশিত হবে '১৫ আগস্ট সংখ্যা'।

হকার বন্ধুদের কাছে অনুরোধ স্বস্তিকার জন্য নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন—

বিশাল বুক সেন্টার

৪, টটি লেন
কলকাতা-৭০০০১৬

ফোন ঃ
(০৩৩) ৪০৬৪৪১০৩
৪০৬৪৪০৯৭

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

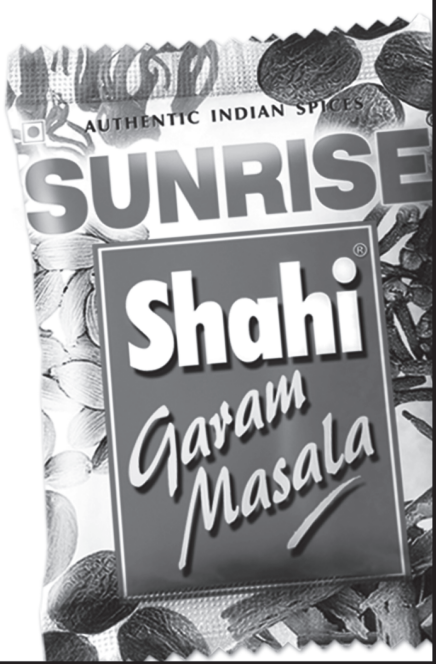

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

সম্পাদকীয়

মমতার বিষোদগার

কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী একটার পর একটা তোপ দাগিয়া চলিয়াছেন। সারদা চিট ফান্ড দুর্নীতি, নারদ স্ট্রিং অপারেশন, নোটবন্দি, জিএসটি, দার্জিলিং এবং বাদুড়িয়া-বসিরহাট—সর্বত্রই কেন্দ্রের ষড়যন্ত্র লক্ষ্য করিতেছেন। সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপিকে 'ভারত ছাড়া' করিবার ডাক দিয়াছেন। ২০১৯-এ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে কেন্দ্রের শাসন ক্ষমতা হইতে বিচ্যুত করিতে হইবে—দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের উদ্দেশে ২১ জুলাইয়ের বার্ষিক সমাবেশে এই ছিল তাঁহার বার্তা। তাঁহার যুক্তি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কংগ্রেস-সহ আঠারোটি বিরোধী দল একজোট হইয়াছিল। উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনেও নাকি আরও দুইটি দল এই জোটে যোগদান করিবে। ২০১৯-এর নির্বাচনে তাই নাকি বিজেপি-র ক্ষমতাচ্যুত হইবার প্রবল সম্ভাবনা। যদিও তিনি বলেন নাই যে তিনি এই বিরোধী জোটের নেতৃত্ব করিবেন, কিন্তু তিনি যে এই জোটে শামিল হইবেন তাহা স্পষ্টই জানাইয়া দিয়াছেন। ঘটনা হইল, জাতীয় স্তরে বিজেপি-র মুখ্য প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস। কিন্তু যে কংগ্রেসের সাহায্যে তিনি বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করিতে চাহেন, সেই প্রয়াসের প্রথম বাধাটাই আসিয়াছে তাঁহার নিজের রাজ্য হইতে। প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি তথা সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী ২০১৯-এ লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের সহিত হাত মিলাইবার সম্ভাবনা অস্বীকার করিয়াছেন। অধীরবাবুর বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি এখন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিতেছে। বিজেপির এই উত্থানে মমতা ভয় পাইতেছেন। এই কারণেই তিনি এখন কংগ্রেসের সাহায্য চাহিতেছেন।

খুব বেশি সময় পিছনের দিকে তাকাইবার প্রয়োজন নাই। কংগ্রেস যখন কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন ছিল, মমতা তখন ভারতকে কংগ্রেস মুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। আবার এখন বিজেপি-মুক্ত ভারত গড়িবার জন্য বিরোধী দলগুলিকে জোটবদ্ধ করিতে সক্রিয় হইয়াছেন। অধীরবাবুর বক্তব্য, যতটুকু তাঁহার জানা আছে তাহাতে সোনিয়াজী পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসকে সহযোগিতা করিবার কথা বলিবেন না। রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের সহিত কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেই থাকিবে। সোনিয়া, নীতীশ, লালু ও নবীন পট্টনায়ককে বিজেপির বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ করিবার চেষ্টা চালাইতেছেন মমতা। কিন্তু বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাঁহার নিজের রাজ্যেই কংগ্রেসের সমর্থন লাভের আশা ক্ষীণ। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তৃণমূলের সহিত কোনোরকম বোঝাপড়ার সম্ভাবনা নাই বলিয়া জানাইয়া দিয়াছেন। বামপন্থী দলগুলি নিজেদের মতো করিয়াই বিজেপির বিরুদ্ধে লড়িতে ইচ্ছুক। মমতা যেখানে থাকিবেন, বামপন্থী দলগুলির সেখানে থাকিবার সম্ভাবনা নাই বলিলেই হয়। বিজেপি বিরোধী লড়াইয়ে কোনও বড় দলের সমর্থন মমতা কতটা লাভ করিবেন সেই বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ থাকিয়া যায়।

সুভাষিতম্

যস্মিন্ যথা বর্ততে যো মনুষ্যস্তস্মিন্ তথা বর্তিতব্যং স ধর্মঃ।

মায়াচারো মায়য়া বর্তিতব্যঃ সাধ্বাচারঃ সাধুনা প্রত্যুপেয়ঃ।। —মহাভারত

মানুষ যে রকম ব্যবহার করে তার সঙ্গে সে রকমই ব্যবহার করাটাকেই ধর্ম বলা হয়। যে ব্যক্তি মায়াচার করে অর্থাৎ মিথ্যা আচরণ করে তার সঙ্গে সে ভাবেই ব্যবহার করা দরকার। ভদ্র লোকদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করাই সমুচিত।

রাইসিনা হিলসে রামনাথ কোবিন্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ 'সকাল থেকেই দিল্লিতে বৃষ্টি হচ্ছে। আমার মনে পড়ছে ছোটবেলার কিছু কথা। আমি তখন আমার পৈতৃক গ্রামে থাকতাম। আমাদের বাড়িটি ছিল মাটির। চাল ছিল খড়ের। যখন আজকের মতো প্রবল বৃষ্টি হোত তখন আমরা সব ভাইবোনেরা দেওয়ালের এক কোণে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি থামার প্রতীক্ষা করতাম। হয়তো



আজও এরকমই কত 'রামনাথ কোবিন্দ' রয়েছেন, কেউ বৃষ্টিতে ভিজছেন, কেউ খেতে কাজ করছেন, কেউবা রাতের খাওয়ার জোগাড়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন, আমি তাদের সকলকেই বলতে চাই 'পরৌখ' গ্রামের এই রামনাথ কোবিন্দ রাষ্ট্রপতি ভবনে যাচ্ছেন তাঁদেরই প্রতিনিধি হিসাবে।'

ভারতীয় গণতন্ত্রের চতুর্দশ রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর এই ছিল রামনাথ কোবিন্দের প্রথম ভাষণ। ১৯৪৫ সালের ১ অক্টোবর উত্তরপ্রদেশের কানপুরের পরৌখ গ্রামে রামনাথ কোবিন্দের জন্ম। বাবার নাম মৌকুলাল মা কলাবতী, রামনাথরা চার ভাই ও তিন বোন। কানপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাণিজ্য এবং আইন বিভাগে স্নাতক ডিগ্রি নেওয়ার সময় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের (আর এস এস) সংস্পর্শে আসেন। ১৯৭১ সালে দিল্লিতে উকিলে হিসেবে কাজ শুরু করেন। ১৯৭৫ সালে তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা পাশ করলেও চাকরিতে যোগ দেননি। ১৯৭৭-৭৮ তিনি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মোরাজী দেশাই-এর আপ্তসহায়ক হিসেবেও কাজ করেন। ১৯৭৭ থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত তিনি দিল্লি হাইকোর্টে কাজ করেন। সরকারের স্ট্যাডিং কাউন্সেল হিসেবে সুপ্রিম কোর্টে ১৯৮০ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। দিল্লি হাইকোর্ট ও সুপ্রিমকোর্টে প্র্যাকটিশ করার সময় তিনি পিছিয়ে পড়া মানুষদের বিনা খরচে আইনি সহায়তা দেওয়ার প্রচেষ্টা চালান।

১৯৯১ সালে তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-তে যোগ দেন। ১৯৯৮ থেকে ২০০২ পর্যন্ত তিনি ছিলেন বিজেপির দলিত মোর্চার সর্বভারতীয় সভাপতি। দলের সর্বভারতীয় মুখপাত্র হিসেবেও কাজ করেছেন। ১৯৯১ সালে লোকসভা ভোটে দাঁড়িয়ে তিনি জিততে না পারলেও তার প্রচেষ্টায় কোলী সমাজ হিন্দুত্বের আন্দোলনে আরও গভীরভাবে যুক্ত হয়। ১৯৯৪ ও ২০০০ সালে দুই বার রাজ্যসভায় নির্বাচিত হন।

২০০২ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। ২০১৫ সালে সাধাসিধে জীবনে অভ্যস্ত কোবিন্দ বিহারের রাজ্যপালের দায়িত্ব নেন। ২০ জুলাই তিনি ভারতের চতুর্দশ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। তার মোট ভোট প্রাপ্তি ৬৫.৬৫ শতাংশ, অন্যদিকে বিরোধী জোটের প্রার্থী পান মাত্র ৩৪.৩৫ শতাংশ ভোট। বিরোধী প্রার্থী অন্ধ্রপ্রদেশে একটিও ভোট পাননি। অন্যদিকে ২১টি রাজ্যে কোবিন্দ পান বিরোধী জোটের চেয়ে বেশি ভোট। সারা দেশে গোবিন্দ ১১৫টি বিরোধী এম এল এ-র ভোট পান। সংসদে বিরোধী প্রার্থীর ২৪০টি ভোট পাওয়ার কথা থাকলেও তারা পায় মাত্র ২২৫টি। বাংলায় ৫ জন বাম-কংগ্রেস বা টিএমসি এমএলএ কোবিন্দের পক্ষে ভোট দেন। রাজ্যের ১০টি ভোট বাতিল হয়েছে। এছাড়াও রাজস্থান (৬), গুজরাট (৮), গোয়া (৫), জম্মু-কাশ্মীর (২), হরিয়ানা (৪), উত্তরপ্রদেশ (১১), হিমাচল প্রদেশ (৪), কর্ণাটক (৮), মহারাষ্ট্র (১৩), মধ্যপ্রদেশ (৬), ছত্তিশগড় (২), পশ্চিমবঙ্গ (৫)-টি বিরোধী ভোট ছিনিয়ে নেয়।

২৫ জুলাই আনুষ্ঠানিক ভাবে কোবিন্দ শপথ নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাইসিনায় শুরু হবে 'রাম রাজ'। রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিনিই হবেন দেশের সেনাবাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডার। প্রাপ্ত সূত্রে খবর, দায়িত্ব নেওয়ার পর সবার আগে লাদাখে যেতে পারেন। লাদাখে রাষ্ট্রপতি গেলে বাহিনীর মনোবল আরও বাড়বে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। এতে চীনকেও বার্তা দেওয়া হবে বলে মনে করা হচ্ছে।■

জে এন ইউ স্থায়ী প্রদর্শনের জন্য সেনা-ব্যবহৃত একটি ট্যাঙ্ক চাইল

নিজস্ব প্রতিনিধি।। জে এন ইউ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এই প্রথম সেখানকার ক্যাম্পাসে 'কার্গিল বিজয় দিবস' উদ্‌যাপন হলো। এই উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জগদীশ কুমার ভারতীয় সেনা বাহিনীর পরাক্রম ও আত্মত্যাগ যাতে ছাত্রছাত্রীদের সতত অনুপ্রাণিত করে সেই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা পূর্বতন সেনাধ্যক্ষ ভি কে সিংহ ও তেল ও পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের কাছে একটি যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় সেনাবাহিনীর ট্যাঙ্ক প্রদান করার অনুরোধ রেখেছেন। ট্যাঙ্কটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় স্থাপন করা হবে।

প্রসঙ্গত, গত বছরের ৯ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ছাত্রদের একটা বড় অংশ দেশবিরোধী স্লোগানে অংশ নিয়ে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছিল। পরিণতিতে



পুলিশকে গ্রেপ্তার পর্যন্ত করতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক বিভাগ ও প্রাক্তনীদের আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে প্রখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় গৌতম গম্ভীর বলেন, দেশের তিরঙ্গা পতাকার সম্মান রাখতে যে কোনো কাজে অংশ নিতে তিনি প্রস্তুত, এ নিয়ে দেশের সেনাবাহিনীর পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত পূর্বতন মেজর জেনারেল জিডি বক্সী ও লেখক রাজীব মালহোত্রা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশদ্বার থেকে সভাস্থল পর্যন্ত এদিনের এক অভূতপূর্ব 'তিরঙ্গা পথসঞ্চালনে' অংশ নেন। এই পতাকাটির দৈর্ঘ্য ছিল ২ হাজার ২ শো ফুট। বক্সী বলেন, না খেলোয়াড়, না সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেতা কেউই আসল নায়ক নন। দেশের প্রধান নায়ক সীমান্তে অতন্দ্র প্রহরারত সেনানীরা। আজকাল নানা আলোচনায় বাক স্বাধীনতার কথা উঠে আসছে। কিন্তু দেশের পতাকার মর্যাদা রক্ষার কাছে কোনো স্বাধীনতাই বড় হতে পারে না। অনুষ্ঠানে হাজির দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীই এই সদর্থক প্রস্তাব যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে শুনেছেন। প্রসঙ্গত সম্প্রতি দেশের এই অন্যতম প্রধান প্রতিনিধিত্বমূলক বিশ্ববিদ্যালয়ে অবাধ দেশবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করতে এখানকার খোল-নলচেই বদলে দেওয়ার কাজ এগিয়ে চলেছে বলে জেনারেল বক্সী মত প্রকাশ করেন।

কার্গিল যুদ্ধে ভারতের বোমারু বিমানের পাল্লায় চলে এসেছিলেন পাক-প্রধানমন্ত্রী শরিফ ও সেনাধ্যক্ষ মুশারফ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ভারত সরকারের সম্প্রতি প্রকাশিত ক্লাসিফায়েড তথ্যাবলী অনুযায়ী কার্গিল যুদ্ধ চলাকালীন ২৪ জুন ১৯৯৯ ভারতীয় যুদ্ধ বিমান জাগুয়ার নিয়ন্ত্রণ রেখার ওপারে পাকিস্তানের গুলতেরি অঞ্চলে পৌঁছে গিয়েছিল। এই বিস্ফোরক সংবাদে প্রকাশ ২৪ জুন বৃহস্পতিবারের সকাল ৮.৪৫ মিনিটে ভারতীয় বায়ু সেনার প্রথম জাগুয়ারটি LOC অতিক্রম করে লেসার গাইডেড সিস্টেম অনুযায়ী অগ্রবর্তী পাকিস্তানি ঘাঁটিতে বোম্বিং-এর জন্য প্রস্তুত হয়। প্রথম বিমানটিকে অনুসরণ করে আসা দ্বিতীয় জাগুয়ার বোমারু বিমানটি যার প্রথম বিস্ফোরণ ঘটানোর কথা, সেই বৈমানিক লক্ষবস্তুর বদলে অন্যদিকে বিস্ফোরণ ঘটায়। পরিভাষায়— outside the laser basket। অর্থাৎ তিনি সামরিক ঘাঁটির ওপর বোমা ফেলেননি।



নওয়াজ শরিফ



মুশারফ

প্রকাশিত তথ্যে উঠে এসেছে ঠিক ওই সময় ঘাঁটিতে অবস্থান করছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ এবং তৎকালীন সেনাধ্যক্ষ পারভেজ মুশারফ। বোমা নিক্ষিপ্ত হয়ে গেলে যে মহাবিপর্যয় ঘটে যেত তা বলা বাহুল্য।

সূত্রে প্রকাশ প্রথম জাগুয়ারটি যখন গুলতেরি থেকে আক্রমণ চালাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল তখন সেখানে যে শরিফ ও মুশারফ উপস্থিত আছেন এ কথা জানা ছিল না। এই গুলতেরি বেস ভারত সীমান্ত থেকে মাত্র ৯ কিলোমিটার দূরত্বে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে অবস্থিত। তৎকালীন পশ্চিমাঞ্চল বায়ু সেনাবাহিনীর প্রধান বিনোদ পাণ্ডে (অবসরপ্রাপ্ত) বয়ান অনুযায়ী প্রথম বোমারু বিমানের চালকের লক্ষবস্তু স্থির করে দ্বিতীয় বিমান চালককে লেসার গাইডেড মিসাইলে প্রথম বিস্ফোরণ ঘটানোর নির্দেশ দেওয়ার কথা। শেষ মুহূর্তে সেদিন প্রথম বৈমানিকের মনে লক্ষবস্তুর কাছে কিছু Logistic Dump-এর উপস্থিতি দেখে সন্দেহ জাগে। তিনি দ্বিতীয় বৈমানিককে টার্গেটের ওপর বিস্ফোরণ ঘটাতে বারণ করেন। বরাত জোরে বেঁচে যান নওয়াজ শরিফ ও মুশারফ।

আরবে বন্দি নাবিকদের মুক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ আরব আমিরশাহীতে ৯৭ জন ভারতীয় নাবিক বন্দি ছিলেন, তাদের মধ্যে ৫৩ জনকে মুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। দেশে ফিরেও এসেছেন তারা। দুবাইয়ের ভারতীয় দূতাবাস সম্প্রতি এই খবর দিয়েছে। আরব নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত জানান, ৯৭ জন জাহাজবন্দি ভারতীয় নাবিকদের মধ্যে ৫৩ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে আরব আমিরশাহীর ফেডেরাল ট্রান্সপোর্ট অথরিটির সাহায্যে শারজা মুন জাহাজ থেকে ৬ জন, আইবিএ থেকে ৬ জন, রোজিয়ান থেকে ১১ জন, স্পিরিট থেকে ৯ জন, ইনকন থেকে ৩ জন, ইনাজ থেকে ৩ জন, সালেম থেকে ৩ জন, সি পেট্রোল থেকে ৩ জন, জুডে থেকে ৩ জন, শেকর থেকে ২ জন, এবং ওস্যান গ্রেস, আয়াদ, স্যান্ড ওয়ান ও সি সেফ থেকে ১ জন করে নাবিককে উদ্ধার করা হয়েছে।



উবাচ



মেহবুবা মুফতি
মুখ্যমন্ত্রী, জম্মু ও কাশ্মীব

“ফারুক সাহেবের একটা নিজস্ব শৈলী আছে।... এক সময় তিনি প্রায়ই বলতেন, অন্যদিকে (পি ও কে, পাকিস্তান) বোমা ফেলে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হতে পারে। আমি বিশ্বাস করি, কাশ্মীরের ক্ষেত্রে চীন ও আমেরিকার কোনও ভূমিকা নেই।”

ন্যাশনাল কনফারেন্স-এর নেতা ও সাংসদ ফারুক আবদুল্লার মন্তব্য প্রসঙ্গে



ডোমিনিক অ্যাশকুইথ
ভারতে ব্রিটিশ হাইকমিশনার

“ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে বিভিন্ন সময়ে এমন সব ঘটনা ঘটছে যা খুবই অনিশ্চিতকর। যা ঘটছে তা কিছুটা বাড়াবাড়ি হতে পারে, কিন্তু সেই অর্থে নতুন কিছু নয়।”

এক সাক্ষাৎকারে বিশ্বব্যাপী উগ্রবাদীদের রমরমা প্রসঙ্গে



কেনেথ রোগোফ
বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ হার্বার্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক

“আধার আইডি প্রকল্প থেকে বিশ্ব অনেক কিছু শিখতে পারে। উন্নত অর্থনীতিতে বাধ্যতামূলক বায়োমেট্রিক আইডেনটিফিকেশন গোপনীয়তা রক্ষার ক্ষেত্রে সম্ভবত উদ্বেগের কারণ হবে না। কিন্তু আগামী দশকে---সাইবার ক্রাইম থেকে সন্ত্রাসবাদ পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই সম্ভবত ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটাবে।”

দিল্লিতে এক অর্থনৈতিক সম্মেলনে



প্রণব মুখোপাধ্যায়
ভারতের বিদায়ী রাষ্ট্রপতি

“প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে দেশের সামগ্রিক পরিবর্তনের চেষ্টা করে চলেছেন। আমার প্রতি ওর সৌজন্য এবং শ্রদ্ধাবোধের কথা আমি আজীবন মনে রাখব।”

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রসঙ্গে

মীরা হয়নি, গোপাল চাই

মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী, তৃণমূলনেত্রী

দিদি, আপনাকে বারবার চিঠি লিখতেই হয়। আপনি পড়ার সময় পান কিনা জানি না। কিন্তু আপনার এই অনুগত সুন্দর ভাইটি নিয়মিত আপনাকে চিঠি লিখে যায়। আসলে রাজ্যে আপনিই সব। আপনাকে জানাতেই হয় খুঁটিনাটি। আর দিল্লি রাজনীতিতে আর কেউ মানুক না মানুক আপনি এবং আমি মানি যে আপনি একটা বড় ফ্যাক্টর। নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহরা কিছুতেই ব্যাপারটা বুঝতে পারেন না।

তাই দিদি বলছি, মীরা কুমারকে জেতানো যায়নি কিন্তু গোপালকৃষ্ণ গান্ধীকে জেতাতেই হবে। এই গোপালের বিরুদ্ধে সিপিএম কত কী না করেছে। গোপাল তখন আপনার। আর এখন আপনি বাঘ আর গোরুকে এক ঘাটে জল খাওয়াচ্ছেন। কে গোরু, কে বাঘ সে নিয়ে কোনও মন্তব্য নয়।

কিন্তু চারিদিকে বিশ্বাসঘাতক। আর তাদের জন্যই হিসেবের থেকেও বেশি ভোট পেয়ে জয়ী হলেন মোদীর প্রার্থী রামনাথ কোবিন্দ। ভোটের ফল থেকেই স্পষ্ট যে, ব্যাপক হারে ক্রস ভোটিং হয়েছে একাধিক রাজ্যে। বিরোধী শিবিরের সাংসদ, বিধায়করা গোপন ব্যালটের সুযোগ নিয়ে দলের নির্দেশ অমান্য করে কোবিন্দকে ভোট দিয়েছেন মীরার বদলে।

বিহারের প্রাক্তন রাজ্যপাল কোবিন্দ পেয়েছেন মোট ভোটের ৬৫ শতাংশের বেশি। কোবিন্দ পেয়েছেন ২৯৩০ টি ভোট। অন্য দিকে, ১৮টি বিরোধী দলের সর্বসম্মত প্রার্থী, লোকসভার প্রাক্তন স্পিকার মীরা কুমার পেলেন ১৮৪৪টি ভোট।

ভোট গণনার পরে দেখা গিয়েছে বিভিন্ন রাজ্যে অনেক ক্রস ভোটিং হয়েছে। বিজেপি আগেই এমন কথা জানিয়ে রেখেছিল। এমনকী, পশ্চিমবঙ্গেও বাড়তি ভোট মিলবে বলে আগাম জানিয়েছিলেন দিলীপ ঘোষরা। সেই আশা অনেকটাই মিলল। কারণ, ফল গণনার পরে দেখা গিয়েছে রাজ্যে মোট ১০টি ভোট বাতিল হয়েছে। দেশে সব থেকে বেশি। বিজেপির যেখানে নিজেদের তিন বিধায়ক ও মোর্চার তিন বিধায়ক মিলিয়ে মোট ৬টি ভোট পাওয়ার কথা সেখানে কোবিন্দ পেয়েছেন ১১টি। রামনাথ কোবিন্দ অতিরিক্ত ৫টি ভোট পেলেও হিসেব অনুসারে মীরা কুমার মোট ১৫টি ভোট কম পেয়েছেন। আপনি ভালই জানেন যে, ভোট নষ্ট করা মানে বিজেপিকে সুবিধা করে দেওয়া। আর সেটাই করেছে ১০ বিশ্বাসঘাতক। আর যদি বিজেপি বা মোর্চার কোনও ভোট নষ্ট হয়ে থাকে তবে তো বিশ্বাসঘাতকের সংখ্যা আরও বেশি।

৫ আগস্ট উপরাষ্ট্রপতি পদের জন্য নির্বাচন। একই দিনে গণনা। লড়াইয়ে বিরোধীদের সম্মিলিত প্রার্থী পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধী। অন্যদিকে শাসকপক্ষের প্রার্থী বিজেপির প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু।

সেই ভোটেও দিদি আপনারা নিজেদের প্রার্থীকে যে জেতাতে পারবেন না সেটা বলে দিচ্ছে অঙ্ক। বিজেপির দাবি, কমপক্ষে ৬০ শতাংশ ভোট পাবেন বেঙ্কাইয়া। ভোটের এখনও বেশ কয়েকটা দিন বাকি রয়েছে। তার আগে আরও সমর্থন এসে যাবে। দেখে নেওয়া যাক এখনও পর্যন্ত কী ফল হতে চলেছে ৫ আগস্টের নির্বাচনে।

উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোটাধিকার রয়েছে লোকসভা ও রাজ্যসভার সদস্যদের। লোকসভায় মোট আসন ৫৪৫। ৫৪৩ জন নির্বাচিত ও ২ জন মনোনীত। অন্যদিকে রাজ্যসভায় মোট সাংসদ ২৪৫। সেই হিসেবে মোট ভোটার ৭৯০ জন। কিন্তু সদ্যপ্রয়াত বিজেপির দুই সাংসদ বিনোদ খান্না ও অনিলমাধব দাভের জায়গায় এখনও নির্বাচন হয়নি। ফলে মোট ভোটার ৭৮৮।

বিনোদ খান্নার মৃত্যুর পরে লোকসভায় এখন এনডিএ-র শক্তি ৩৩৭। অন্যদিকে রাজ্যসভায় ৭৭। এর পরেও বিজেপির জোটে না থাকা তিনটি দল এআইডিএমকে, টিআরএস, ওয়াইএসআর কংগ্রেস নাইডুকে আগেই সমর্থন জানিয়েছে। এতে লোকসভায় ৫৪ ও রাজ্যসভায় ১৭ ভোট বেঙ্কাইয়া পাবেন।

বুঝতেই পারছেন অবস্থাটা নেহাতই খারাপ। তাই বলি কী এই কদিন একটু উঠে পড়ে লেগে বিজেপির কিছু ভোট ভাঙাতে হবে। তা না হলে যে শ্যামও থাকবে না কুলও থাকবে না।

—সুন্দর মৌলিক

পশ্চিমবঙ্গে লড়াইটা এখন বিজেপি বনাম তৃণমূলের

একদা ব্রিটিশ রাজশক্তিকে 'ভারত ছাড়া' করার কঠিন শপথ নিয়েছিলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। আর তার পঁচাত্তর বছর পর আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শপথ নিলেন, 'বিজেপিকে ভারত ছাড়া করব।' বিজেপি মুক্ত ভারত গড়ব। মোহনদাসের ডাকে সাড়া দিয়েছিল আসমুদ্র হিমাচল। মুখ্যমন্ত্রীর ডাকে তেমন সাড়া শোনা গেল না দলের কর্মী সমর্থকদের কণ্ঠে। মরিয়া দিদি চিৎকার করে বললেন, 'হাত তুলে সমর্থন জানান'। দেখা গেল মঞ্চে বসা কয়েকজন হাত তুললেন। বাকিরা বাড়ি ফেরার পথ খুঁজছেন। বসিরহাট-বাদুড়িয়ার দাঙ্গার পর হিন্দু শক্তিকে ধ্বংস করার শপথ যে তৃণমূল সমর্থকরা নেবেন না সেই বার্তা স্পষ্টভাবে তাঁরা নেত্রীকে জানিয়ে দিলেন। বাধ্য হয়ে নেত্রী গরম গরম বুলি বন্ধ করে মঞ্চে জাতীয় সঙ্গীত শুরু করতে নির্দেশ দিলেন। ২১ জুলাই দলের শহিদ দিবসে নেত্রীকে এতটা বেইজ্জত হতে এর আগে দেখিনি। যেমন, বাংলার ৪২টি সংসদীয় আসনেই তৃণমূল প্রার্থীদের জেতাতে নেত্রী সমর্থকদের আহ্বান জানালেন। ভেবেছিলাম সমর্থনে সমবেত জনতার মহাগর্জন শোনা যাবে। শোনা গেল না।

একটা কথা স্পষ্ট যে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক লড়াইটা এখন তৃণমূল এবং বিজেপির মধ্যেই সীমাবদ্ধ হচ্ছে। তৃণমূলের জনপ্রিয়তা দ্রুত কমছে। প্রতিদিন সিবিআই, ইডি, আয়কর দপ্তরের জেরায় নাজেহাল হচ্ছেন দলের সিনিয়ার নেতারা। আর দলের সুপ্রিমো নেত্রী বলছেন তিনি সিবিআই, ইডির বিরুদ্ধে হাজার হাজার কোটি টাকার মানহানির মামলা করবেন। মামার বাড়ির আবদার। তদন্তের স্বার্থে পুলিশ বা তদন্তকারী সংস্থা অভিযুক্তদের জেরা করতেই পারে। তার জন্য যে মানহানির মামলা করা যায় না এই সাধারণ জ্ঞানটুকুও নেত্রীর নেই। তাঁর এ কথাও জানা নেই যে তৃণমূলের জন্মের বহু বছর আগে ভারতে বিজেপির জন্ম হয়েছে। বিজেপি সর্বভারতীয়

গূঢ় পুরুষের

কলম

রাজনৈতিক দল। আর দলের নামের আগে 'অল ইন্ডিয়া' লিখে দিলেই তৃণমূল সর্বভারতীয় দল হয়ে যায় না। শুধুমাত্র বাংলায় ক্ষমতা হাতে পেয়ে নেত্রী মনে করছেন ২০১৯ সালে তিনি একাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ক্ষমতাচ্যুত করবেন। কীভাবে? রাজ্যের ৪২টি আসনে জিতলেও তা' সম্ভব নয়। নেত্রী বলছেন, লালুপ্রসাদ, সিপিএম, কংগ্রেস, তৃণমূল সব তাদের নিজস্ব পরিকল্পনা নিয়ে ২০১৯ সালে লোকসভার নির্বাচনে লড়ে যাবে। তাতেই নাকি বিজেপির পতন হবে। পাগলের প্রলাপ বলে মনে হচ্ছে না? রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আগে তিনি বলেছিলেন যে এন ডি এ-র প্রার্থীকে হারাতে তিনি ১৮ দলের বিরোধী জোট গড়েছেন। দেখা গেল সেই জোটে তৃণমূল ছাড়া দ্বিতীয় কোনো দলই নেই।

দিদি যা বলেন তার ৯৫ শতাংশ কথাই অসত্য। যেমন, তিনি রাজ্য চালাচ্ছেন কেন্দ্রের অর্থ সাহায্য ছাড়াই। কেন্দ্রীয় অর্থ বরাদ্দ ছাড়া পুরো এক সপ্তাহ রাজ্য প্রশাসন চলবে না। সত্য হচ্ছে, বাংলাকে উদারভাবে কেন্দ্রীয় অর্থ সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। বাংলার জন্য যে অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার দেয় তার অর্ধাংশও গুজরাট বা অন্ধ্রপ্রদেশ পায় না। সে কথা দিদি বলেন না। রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচনে বিজেপি মনোনীত প্রার্থী রামনাথ কোবিন্দকে হারাতে দিদি কোমর বেঁধেছিলেন। এখন কোবিন্দের শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে তিনি সবার আগে দিল্লি পৌঁছেছেন। তাই তাঁর বিজেপি মুক্ত ভারত গড়ার শপথে দলের সমর্থকরাই অবিশ্বাসী। তৃণমূল নেত্রীর প্রতি অবিশ্বাস এবং বিজেপির প্রতি সাধারণ মানুষের সমর্থনের কারণ নেত্রীর অতিরিক্ত মুসলমান তোষণ। বসিরাহাট-বাদুড়িয়ায় দাঙ্গা চলার সময় দিদি নিজেই স্বীকার করেছিলেন যাদের জন্য তিনি এত কিছু করেছেন সেই সম্প্রদায়ের লোকেরা দাঙ্গা করে তাকে বিপদে ফেলেছে। হ্যাঁ, এটাই ভারতীয় রাজনীতির অলিখিত নিয়ম। যে গান্ধীজী তাঁর সারা রাজনৈতিক জীবনে মুসলমান তোষণ করেছিলেন তাঁকেই জিন্না সাহেব দেশভাগ করতে পিছন থেকে ছুরি মেরেছিলেন। গান্ধীর রাজনৈতিক মৃত্যু হয়েছিল। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতে চলেছে। মুসলমান তোষণ নীতি তৃণমূল নেত্রীর রাজনৈতিক জীবন শেষ করবে।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন পড়ান

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির অশনি সংকেত

প্রণব দত্ত মজুমদার

গত কয়েক বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের বুকে মুসলমান মৌলবাদীদের তাণ্ডব ও ধ্বংসলীলা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। অথচ আমাদের যারা শাসক তাঁরা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের প্রেমের বাণী শুনিয়ে, সংখ্যালঘু বলে ক্রমাগত তাদের ক্ষমা করে দিচ্ছেন। অধিকাংশ রাজনৈতিক দল সেকুলারিজমের দোহাই দিয়ে সংখ্যালঘুদের স্নেহভালবাসা পাওয়ার লোভে মূল সমস্যাটি এড়িয়ে যাচ্ছেন। শাসক ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির তোল্লা পেয়ে পেয়ে মুসলমান মৌলবাদী শক্তি পশ্চিমবঙ্গে তাদের পরিধি ক্রমশই প্রসারিত করে চলেছে।

মুসলমান মৌলবাদীদের দ্বারা সংগঠিত গত ৩০ জুন থেকে প্রায় এক সপ্তাহ ধরে চলা বসিরহাটের বাদুড়িয়ার ঘটনা, ২০১৬ সালের জানুয়ারিতে মালদার কালিয়াচকের ঘটনা, ২০১৬ সালের ১৪ ডিসেম্বর হাওড়ার ধুলাগড়ের ঘটনা, ২০১৬ সালের হাজিনগরের ঘটনা, ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার উস্থির ঘটনা, ২০১৪ সালের অক্টোবরে বর্ধমানের খাগড়াগড়ের ঘটনা— এরকম আরও বেশ কয়েকটি ঘটনা যার প্রতিটি ক্ষেত্রেই মুসলমান মৌলবাদীরা বহু নিরপরাধ নিরীহ হিন্দুদের ঘরবাড়ি দোকানপাট লুটপাট করে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। নিরপরাধ হিন্দুদের খুন পর্যন্ত করেছে। পশ্চিমবঙ্গের অনেক মুসলমান-অধ্যুষিত এলকায় হিন্দুদের পূজাপার্বণের উপর নানারকম বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করছে ওরা। হাওড়া জেলার তেহট্ট হাইস্কুলে এবছর সরস্বতী পূজা করতে বাধা দিয়েছে মুসলমান মৌলবাদীরা। এগুলো কি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মনে হচ্ছে? নাকি বড় কোনো ঘটনা ঘটাবার আগে পরিস্থিতি মেপে নেওয়ার কৌশল। আমাদের ধুরন্ধর রাজনৈতিক নেতারা, যারা নাকি মানুষ চরিয়ে খান— এই অশনি সংকেত কি বুঝতে পারছেন না? নাকি রাজনৈতিক স্বার্থজনিত কারণে সমস্যাটিকে এড়িয়ে যাচ্ছেন।

প্রাকস্বাধীনতাকালে কংগ্রেস, কমিউনিস্টদের মুসলমান তোষণের ফলেই ভয়াবহ মুসলমান মৌলবাদ অবিভক্ত ভারতবর্ষে বিস্তার লাভ করেছিল এবং অবশেষে তারা 'জিহাদ' করে ভারতবর্ষকে টুকরো করে মুসলমানদের জন্য ইসলামিক রাষ্ট্র 'পাকিস্তান' গঠন করেছে। প্রাকস্বাধীনতাকালের সেই ইতিহাসের যেন পুনরাবৃত্তি ঘটতে চলেছে— তারই যেন অশনি সংকেত পাওয়া যাচ্ছে। কী ছিল সেই ইতিহাস? এ প্রজন্মের কাছে তা তুলে ধরা দরকার যাতে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমানে তারা সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারে।

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের বাংলা ভাগকে কেন্দ্র করে সারা বাংলা জুড়ে স্বদেশী আন্দোলনের যে ঢেউ উঠেছিল তা দ্রুত সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। স্বাধীনতার স্পৃহা জেগে উঠেছিল অনেক তরুণ বিপ্লবীদের মনে। সারা দেশ বিশেষ করে বাংলায় 'অনুশীলন সমিতি', 'যুগান্তর'-এর মতো অনেক গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন গড়ে উঠতে থাকলো। শুরু হলো ইংরেজদের উপর আঘাত। যেহেতু অবিভক্ত বাংলার বিপ্লবীদের প্রায় সবাই ছিল হিন্দু, তাই হিন্দু জনগোষ্ঠীর মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার জন্য ইংরেজ একটি নতুন কৌশল অবলম্বন করেছিল। ইংরেজ শাসক, ১৯০৬ সালে ঢাকার নবাব শালিমুল্লাকে প্ররোচিত করে 'মুসলিম লিগ' নামক একটি সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলের জন্ম ঘটাল এবং হিন্দু মুসলমানের বিভেদের রাজনীতি আমদানি করা হলো বাংলায়, যা পরে সারা ভারতে ছড়িয়েছিল। ১৯১১ সালে ইংরেজ বাধ্য হয়েছিল 'বঙ্গভঙ্গ' রদ করতে। ইংরেজ শাসক বাঙালি বিপ্লবীদের ভয়ে রাজধানী কলকাতা থেকে সরিয়ে দিল্লি নিয়ে গেলেন ১৯১১ সালে।

সেই সময়ে গান্ধীজী কর্মোপলক্ষে দক্ষিণআফ্রিকায় ছিলেন। তিনি সেখানকার বর্ণবিদ্বেষী-শ্বেতাঙ্গ-সরকার কর্তৃক কৃষ্ণাঙ্গদের উপর এবং সেখানকার প্রবাসী ভারতীয়দের উপর উৎপীড়ন-অত্যাচারের বিরুদ্ধে অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন। এর ফলস্বরূপ ১৯১৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকার ভারতীয়দের জন্য বিশেষ কিছু সুযোগ সুবিধা মঞ্জুর করেছিলেন। এই ঘটনায় অহিংসবাদী সত্যাগ্রহী গান্ধীজীর বেশ নামডাক হলো। কংগ্রেসিদের মধ্যে তখন দুটো বিভাজন তৈরি হয়ে গেছিলো— 'নরমপন্থী' আর 'চরমপন্থী'। 'নরমপন্থী'রা ইংরেজদের সঙ্গে সংঘাতে যেতে চাইতেন না। 'চরমপন্থী'রা মনে করতেন সংঘাত করেই ইংরেজকে এ দেশ থেকে তাড়াতে হবে। 'নরমপন্থী'রা গান্ধীজীকে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ডেকে এনে কংগ্রেসের নেতৃত্বে বসিয়ে দিলেন।

গান্ধীজী ভারতবর্ষে আসেন ১৯১৫ সালের জানুয়ারি মাসে। তিনি গুজরাটের সবরমতিতে 'সত্যাগ্রহ আশ্রম' তৈরি করে রাজনৈতিক নেতাদের অহিংসার পথে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের দর্শন শিক্ষা দিতে লাগলেন। গান্ধীজী অহিংস সত্যাগ্রহের তত্ত্ব বোঝাতে বলতেন "A Satyagrahi should expect to get killed by an agreessor and not to kill him." এর থেকে বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় কেন ইংরেজ সরকারের কাছে গান্ধীজী এত গ্রহণীয় হয়েছিলেন। গান্ধীজী ধীরে ধীরে কংগ্রেসের নেতৃত্বের রাশ নিজের হাতে নিয়ে নিলেন। যে সব বিপ্লবীরা বোমা ছুড়ে গুলি করে ইংরেজ হত্যা করতেন তাঁদের গান্ধীজী বিপথগামী বলে নিন্দা করতেন। প্রায় সব কংগ্রেস নেতাকেই তাঁর বশে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। শুধু সুভাষ বসুর মগজ ধোলাই করতে পারেননি। সুভাষ বসু গান্ধীজীর Nonviolence, Civil disobedience, সত্যাগ্রহ ইত্যাদিকে শক্তিশালী ও ধূর্ত ইংরেজের বিপক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী উপায় বলে মনে করতেন না এবং তাঁর পথে চলতে চাইতেন না। তাই সুভাষচন্দ্রকে (১৯৩৯ সালে) জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পদে নির্বাচিত হওয়া

সত্ত্বেও কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছিলেন গান্ধীজী।

এই ভাবে গান্ধীজী হিন্দুদের মধ্যে অবিসংবাদী নেতা হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে তাঁর সেরকম কোনো গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হলো না। আসলে মুসলমান সমাজের গরিষ্ঠ অংশের ভিতর ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সম্পর্কে কোনো আগ্রহই ছিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) শেষে তুরস্কে 'খলিফা' তন্ত্রের অবসান হলে ভারতবর্ষের এই মুসলমান জনগোষ্ঠী তুরস্কের খলিফাতন্ত্রকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলনের আরম্ভ করেছিল যা 'খিলাফত' আন্দোলন বলে পরিচিত। ১৯১৯ সালে গান্ধীজী কুখ্যাত 'রাউলাট অ্যাক্ট'-এর প্রতিবাদে সারা দেশ জুড়ে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন। এই সময় গান্ধীজী মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবার জন্য তোষণের রাস্তা ধরলেন। তিনি মুসলিম লিগ নেতাদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে 'খিলফত'-এর মতো একটি সম্পূর্ণ ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক আন্দোলনকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনের একটি অ্যাজেন্ডা হিসেবে ঘোষণা করলেন। তাঁর এই পদক্ষেপের ফলে ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক মুসলিম লিগ কৌলীন্য পেয়ে গেল। এর আগে মুসলিম লিগ (যা ১৯০৬ সালে তৈরি হয়েছিল) ভারতীয় রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবস্থানে ছিল না। এই প্যান-ইসলামিক আন্দোলনকে মদত দিতে গান্ধীজীকে বারণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে আরম্ভ করে লালা লাজপত রাই, মদন মোহন মালব্য, চিত্তরঞ্জন দাস, বিপিন চন্দ্র পাল প্রমুখ মনীষীরা।

গান্ধীজী ছিলেন একরোখা একনায়ক ধরনের, তিনি যেটাকে ঠিক মনে করতেন তাই করতেন এবং কংগ্রেসের সবাইকে সেটা মানতে বাধ্য করতেন। সুতরাং গান্ধীজী কারোর কথা শুনলেন না। জাতীয় কংগ্রেসের ছাতার তলায় খিলাফতের মত ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক আন্দোলন চলল। গান্ধীজী মাঝপথে তাঁর আন্দোলন প্রত্যাহার করেছিলেন। 'খিলাফত' ব্যর্থ হওয়ায় হিন্দুদের উপর তাদের রাগ বেড়ে গেল। কিন্তু এই আন্দোলনের ফলে সারা ভারতের মৌলবাদী মুসলমানরা গান্ধীজী ও কংগ্রেসের রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় নিজেদেরকে সংগঠিত করে ফেলল এবং ইসলামিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার যৌক্তিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হলো। এর ফলে ভারতবর্ষের বৃহৎ অংশের মুসলমানদের মনে ইসলামিক রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন জাগরূক হলো। বলা যায় ইংরেজের হাত ধরে 'মুসলিম লিগ' নামক যে সাম্প্রদায়িক বিষবৃক্ষটি রোপিত হয়েছিল গান্ধজী তার গোড়ায় জল সার দিয়ে তাঁকে পল্লবিত হতে সাহায্য করলেন।

এর ফলস্বরূপ ১৯২১ সালে দক্ষিণ ভারতের মালাবার অঞ্চলে মোপালা মুসলমান গোষ্ঠী শত শত হিন্দুদের হত্যা করেছিল, শত শত হিন্দুদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছিল, শত শত হিন্দু রমণীদের ইজ্জত নষ্ট করেছিল, বহু হিন্দুকে বলপূর্বক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করে। ইতিহাসে এই ঘটনাটি 'মোপালা বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। আসলে এটি ছিল একটি ইসলামিক 'জিহাদ'। গান্ধীজী মুসলমানদের তোষণ করে মন পাওয়ার জন্য এই ঘটনায় নিষ্ঠুর মোপালাদের পক্ষেই কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন এর জন্য হিন্দুরাই দায়ী, তারাই মোপালাদের খেপিয়ে তুলেছে। মোপালাদের এই জঘন্য আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকার কড়া ব্যবস্থা নিয়েছিল বলে গান্ধী উল্টে তার নিন্দা করেন। মোপালা মুসলমানরা যখন 'জিহাদের' জন্য হিন্দুদের হত্যা করছে, ইংরেজদের মারছে তখন গান্ধীজী তাদের সাহসী জাতি বলছেন, এটাকে তাদের স্বাধীনতার লড়াই বলছেন। আর ক্ষুদিরাম, সূর্যসেন, ভগত সিং-এর মতো বিপ্লবীরা যখন দেশকে স্বাধীন করবার জন্য ইংরেজ মেরে হাসতে হাসতে ফাঁসি যাচ্ছেন গান্ধীজী তাদের 'বিপথগামী সন্ত্রাসবাদী' বলছেন।

এখানে আরও একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯২৬ সালের ২৩ ডিসেম্বর আর্য্য সমাজের প্রচারক স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে আব্দুল রসিদ নামে এক মুসলমান আততায়ী হত্যা করে। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ আসলে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্মান্তরিত হওয়া কিছু মুসলমানকে পুনরায় হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনার জন্য শুদ্ধি-যজ্ঞের ব্যবস্থা করেছিলেন। গান্ধীজী এক্ষেত্রেও মুসলমান আব্দুল রসিদের কোনো দোষ দেখতে পেলেন না। তিনি এই কাজের জন্য স্বামী শ্রদ্ধানন্দকেই দায়ী করলেন। তিনি বললেন, স্বামী শ্রদ্ধানন্দর কাজ মুসলমানদের খেপিয়ে তুলেছে, তাই এমন ঘটনা ঘটেছে। এইভাবে মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য গান্ধীজীর ধারাবাহিক মুসলমান তোষণ ভারতীয় রাজনীতিতে মুসলমান মৌলবাদকে বাড়তে এবং শক্তি সঞ্চয় করতে সাহায্য করেছে, তাদের হিন্দু বিরোধিতায় ইন্ধন জুগিয়েছে। কংগ্রেস দলও অন্ধের মতো গান্ধীজীর এই মুসলমান তোষণ নীতিকে অনুসরণ করে গেছে।

মুসলমানদের মনের ভিতরে ইসলামিক রাষ্ট্র গঠনের যে সুপ্ত বাসনা ছিল সেটা গান্ধীজী ও কংগ্রেসের মুসলমান-তোষণের অনুকুল পরিস্থিতিতে বাড়তে লাগল। অবশেষে ১৯৪০ সালে মুসলিম লিগ আনুষ্ঠানিক ভাবে কোরান ভিত্তিক ইসলামিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের দাবি পেশ করল। কমিউনিস্টরা মুসলিম লীগের এই দাবিকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। তফশিলি জাতির নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল মুসলিম লিগের পাকিস্তান দাবিকে সমর্থন করেছিলেন। অর্থাৎ 'কমিউনিস্ট-দলিত-মুসলমান' এই সোনালী ত্রিভুজ তখন থেকেই অভিন্ন হৃদয়।

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে ব্রিটিশ সরকারের পরিস্থিতি খুবই জটিল হয়ে উঠেছিল এবং ভারতবর্ষকে পরাধীন করে রাখা ওদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠায় ওরা ঠিক করল ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেবে। সেই কারণে ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে 'ক্যাবিনেট-মিশন' পাঠায় ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপার খতিয়ে দেখতে। মুসলিম লিগ নেতা মহম্মদ আলি জিন্না মুসলমানদের জন্য আলাদা দেশ পাকিস্তানের দাবিতে অনড় রইলেন। কংগ্রেস, হিন্দুমহাসভা ইত্যাদি দলের নেতারা ভারত ভাগ চাইছিলেন না, পাকিস্তান গঠনের ব্যাপারে কংগ্রেস-সহ অন্য দলগুলির অনীহা দেখে ১৯৪৬ সালের ২৯ জুলাই মুসলিম লিগ সিদ্ধান্ত নিল যদি ১৫ আগস্ট-এর মধ্যে তাদের দাবি মেনে না নেওয়া হয় তবে তা আদায় করার জন্য ১৬ আগস্ট তারা 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন' করবে।

'ডাইরেক্ট অ্যাকশন' আসলে ইসলামিক 'জিহাদে'র একটি কৌশলী নাম। 'জিহাদ' হলো অমুসলমান (কাফের)-দের ধ্বংস করে দুনিয়া জুড়ে ইসলামের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার উপায়। 'জিহাদ' করাকে কট্টরপন্থী মুসলমানরা অতি পবিত্র কাজ বলে মনে করে। তারা বিশ্বাস করে 'জিহাদ' করলে জান্নাতে (স্বর্গে) যাওয়া যায়। এ পর্যন্ত জিহাদ করে ৪টি মহাদেশে ৫৭টি ইসলামিক রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে।

তখন অবিভক্ত বাংলায় মুসলিম লিগের প্রাদেশিক সরকার চলছিল। সুরাবর্দি তখন তখন বাংলার প্রধানমন্ত্রী। তিনি তলায় তলায় ডাইরেক্ট অ্যাকশন নামক 'জিহাদের' ঘুটি সাজিয়ে রেখেছিলেন। বাংলার রাজধানী কলকাতাকে তারা জিহাদের স্থল হিসেবে বেছে নিয়েছিল।

কংগ্রেসের টালবাহানার মধ্য দিয়ে ১৬ আগস্ট এসে গেল। ওই দিন সকাল বেলায় নামাজের পরে মুসলিম লিগের হাজার হাজার লোক কলকাতার ময়দানে অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে জমায়েত হলো। প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দি, কলকাতায় মেয়র এস এন ওশমান গরম গরম বক্তৃতা দিয়ে মুসলমান জনতাকে উত্তেজিত করে তুললেন। নেতারা বক্তৃতা দিয়ে চলে যাওয়ার পরেই হাজার হাজার উত্তেজিত মুসলমান 'আল্লা-হো- আকবর, পাকিস্তান জিন্দাবাদ, মুসলিম লিগ জিন্দাবাদ, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান।' ইত্যাদি ধ্বনি দিতে দিতে সারা কলকাতার হিন্দুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সারা কলকাতা শহর জুড়ে চলল অবাধে নারকীয় হিন্দু হত্যা, হিন্দুদের ঘরবাড়ি দোকানপাঠ লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, হিন্দুনারীদের শ্লীলতাহানি।

পার্ক সার্কাস, ধর্মতলা, রাজাবাজার, বেলগাছিয়া, কলাবাগান বস্তি, ক্যানাল ওয়েস্ট, মানিকতলা, খিদিরপুর, লালাবাগান, বি টি রোড, জাকারিয়া স্ট্রিট, ক্যানিং, রিপন স্ট্রিট, কলেজস্ট্রিট, বড়বাজার, বৌবাজার, মির্জাপুর স্ট্রিট, শিয়ালদহ, টেরিটিবাজার, লোয়ার চিতপুর রোড, মল্লিকবাজার, গড়পার, যোগীপড়া লেন অর্থাৎ উত্তরে শ্যানবাজার থেকে দক্ষিণে ওয়াটগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে তিনদিন ধরে চলেছিল হিন্দুবধ যজ্ঞ— ইতিহাসে যা 'The Great Calcutta killing' নামে পরিচিত। প্রায় পাঁচ হাজার লোককে হত্যা করেছিল মুসলমান জিহাদিরা আর পনের হাজারের মতো আহত হয়েছিলেন। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় মতদেহের স্তূপ, তাকে ঘিরে শকুনের ভিড়, আর চারদিকে হিন্দু হত্যার উল্লাস।

কলকাতায় হিন্দুদের পশুর মত বলি দেওয়া হলেও এই নারকীয় ঘটনায় দিল্লির কংগ্রেস কর্তারা বিশেষ করে গান্ধীজী এবং নেহেরু নির্বিকার রইলেন। পাকিস্তান দাবির রফা হলো না দেখে মুসলিম লিগ আবারও 'জিহাদে'র এর কর্মসূচি নিয়েছিল। এবার তারা জিহাদ করলো পূর্ববাংলার নোয়াখালিতে ১৯৪৬ সালের ১০ অক্টোবর কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার দিন। সেও হয়েছিল সাংঘাতিক নারকীয়। হাজার হাজার হিন্দুর দোকান পাট ঘর বাড়ি লুটপাট করে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, হিন্দুদের মন্দির অপবিত্র করা হয়, মূর্তি ভেঙে ফেলা হয়, হাজার হাজার হিন্দু রমণীকে ধর্ষণ করা হয়, হাজার হাজার হিন্দুকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়। মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে না চাইলে তাদের হত্যা করা হয়। দু-সপ্তাহ ধরে হিন্দুদের উপর এই পাশবিক অত্যাচার চলেছিল। ইতিহাসে তা 'Noakhali Genocide' নামে আখ্যায়িত।

১৯৪৬ সালে 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন' নামক ভয়াবহ জিহাদের ফলেই তখন ভারতের ২৪ শতাংশ মুসলমানের কাছে মাথা নত করে ১৯৪৭ সালে কোরানভিত্তিক রাষ্ট্র 'পাকিস্তান' গড়ার দাবিকে মেনে নিতে হয়েছিল। ধর্মের ভিত্তিতে 'ইসলামিক রাষ্ট্র' পাকিস্তান তৈরি হলেও ভারতবর্ষকে 'সেকুলার রাষ্ট্র' ঘোষণা করা হলো। শুধু তোষণের কারণে গান্ধীজীর অনুগামী নেহরু 'পপুলেশন এক্সচেঞ্জ'-এ রাজি হলেন না; ভারতবর্ষকে সেকুলার রাষ্ট্র বানাবার পরেও শুধু মুসলমান তোষণের কারণে 'Uniform Civil Code' বানালেন না নেহরু, যদিও ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী দাবি করেছিলেন সবার জন্য One Social Doctrine– 'Uniform Civil Code'। হিন্দুদের জন্য পাশ করানো হলো Hindu Marriage Act, Hindu Succession Act, Hindu Minority & Guardianship Act এবং Hindu Adoption & Maintenance Act. আর মুসলমানদের জন্য ওইসব বিষয়ে বহাল থাকল তাদের ইসলামিক কানুন 'শরিয়ত'। অদ্ভুত সেকুলারিজম। মুসলমানদের অন্যায়, অত্যাচার, অপকীর্তির বিরুদ্ধে কোনো কথা বললেই তুমি সাম্প্রদায়িক, 'সেকুলারিজম' নামক 'হিন্দুর সতীত্ব' নষ্ট হয়ে গেল তোমার; বুদ্ধিজীবী মহলে তুমি একঘরে হয়ে যাবে।

এই ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বর্তমানে আমাদের দেশের পরিস্থিতি যদি বিশ্লেষণ করি তবে কি ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি দেখতে পাচ্ছি না? কলকাতার একটি নামকরা মসজিদের ইমাম ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ফতোয়া দিচ্ছেন, টি ভি ক্যামেরার সামনে জোর গলায় বলছেন মুসলমানদের জন্য জিহাদ করে ভারতে আবার পাকিস্তান বানাবেন। উস্থি, খাগড়াগড়, কালিয়াচক, হাজিনগর, ধুলাগড়, তেহট্ট, বসিরহাট-এর মতো ঘটনায় অশনি সংকেত পাওয়া যাচ্ছে--- ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির। অথচ সবাই কী নির্বিকার। মৌলবাদী মুসলমানদের কর্মকাণ্ড দেখেও মেকী সেকুলার রাজনৈতিক দলগুলি, মেকী-সেকুলার বুদ্ধিজীবীরা নিজ নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য নির্লজ্জ তোষণ করে মৌলবাদী জিহাদি গোষ্ঠীগুলিকে শক্তি ও সাহস জুগিয়ে চলেছে গান্ধীজী-নেহরুর আমলে যেমনটি হয়েছিল। সেকুলারিজমের নামে মুসলমান তোষণের ট্র্যাডিশন বয়ে চলেছে। ইতিহাস থেকে আমরা শিক্ষা নিচ্ছি না। জিহাদিরা সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করছে; এবং মাঝে মাঝে দাঙ্গা করে পরিস্থিতি যাচাই করে নিচ্ছে। সঠিক সময়টি এসে গেলেই ৪৬ এর ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে। জিহাদিরা ভারতবর্ষকে আবার ও টুকরো করবে; এবং তা শুরু হবে এই পশ্চিমবঙ্গ দিয়ে, কারণ এই পশ্চিমবঙ্গকে জিন্নার থাবা থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী সেটা জিহাদিরা ভুলতে পারেনি। তাই তারা প্রত্যাঘাতের জন্য তৈরি হচ্ছে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির অশনি সংকেত পাওয়া যাচ্ছে। ■

ভারতের অন্তরঙ্গ বন্ধু ইজরায়েল

ইন্দ্রাণী বাগচি

ভারতে কখনও কোনও ইহুদিকে ধর্মীয় কারণে নির্যাতন করা হয়নি। জাপানও হয়ে ওঠেনি শত্রুদেশ। তাই চীন ইজরায়েলের বৃহত্তম বাণিজ্য সহযোগী এবং বিনিয়োগকারী দেশ হলেও, ভারতের সম্ভাবনা চীনের থেকে অনেক বেশি।

রাষ্ট্রপুঞ্জ এখনও পুরনো জেরুজালেমের ভারতীয় পান্থশালাটিকে শরণার্থী কল্যাণের কাজে ব্যবহার করে থাকে। অন্য যেসব দেশের আশ্রয় শিবির এখানে ছিল সময় পাল্টানোর সঙ্গে সঙ্গে তারা যে যার মতো পিঠটান দিয়েছে। কয়েক বছর আগে একজন ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী পান্থশালাটি পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন। সেই সময় বেশ কিছু অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি পান্থশালাটি দখল করে বসেছিল। তিনি অবিলম্বে তাদের স্থানান্তরিত করার নির্দেশ দেন। উদ্দেশ্য, পান্থশালাটির মৌলিক চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই ঘটনা ভারত এবং ইজরায়েলের সম্পর্কের মৌলিক বিশেষত্বগুলিকে প্রতীকায়িত করে। বলা যেতে পারে সম্পর্কের মূল সুরটি ধরিয়ে দেয়। সম্প্রতি যে সম্পর্ক ভিন্নমাত্রায় পৌঁছে আলোড়ন ফেলে দিয়েছে।

২০১৪ সালের ১৬ মে প্রধানমন্ত্রী হবার পর নরেন্দ্র মোদীকে বিদেশি রাষ্ট্রনেতাদের মধ্যে প্রথম অভিনন্দিত করেছিলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানেয়াহু। কিন্তু তা সত্ত্বেও নরেন্দ্র মোদী তাঁর মধ্য প্রাচ্য সফরের একেবারে শেষ ধাপে রেখেছিলেন ইজরায়েলকে। ভারতের 'থিঙ্ক ওয়েস্ট' নীতি অনেকগুলি ভারসাম্য রক্ষাকারী শর্তের ওপর নির্ভরশীল। যে নীতির তৃতীয় মেরু হলো ইজরায়েল। মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনীতির যে চরিত্র তাতে একটা বিষয় পরিষ্কার, জেরুজালেমে দুঃসাহসিক অভিযান করার আগে ভারতকে অন্যান্য দেশের সঙ্গে তার সম্পর্কের ভিতটি মজবুত করে নিতে হবে।

নরেন্দ্র মোদীর ইজরায়েল সফরে দুটি বিষয় বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। এক, তাঁর প্যালেস্টাইন না যাওয়া এবং দুই, সফরের একেবারে শুরুতেই থিয়োডর হার্জলের সমাধি দর্শন করতে যাওয়া। হার্জলে ছিলেন জিওনিস্ট আন্দোলনের জনক। হার্জলের সমাধিতে গিয়ে নরেন্দ্র মোদীর ইজরায়েল নামক দেশটির আদর্শগত ভিত্তিকে স্বীকৃতি দিলেন। যে কারণে ইজরায়েলে কাজ করা প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ড্যান শ্যাপ্রিও একটি টুইটবার্তায় বলেন, 'ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিস্ময়কর ভাবে সফল সফর থেকে ইজরায়েলের প্রাপ্তিও নেহাত কম নয়। মার্কিন প্রেসিডেন্টের সফর থেকেও এমন বিপুল প্রাপ্তিযোগ সম্ভব ছিল না।'

পোপকে যেভাবে অভ্যর্থনা করা হয়, ঠিক সেই ভঙ্গীতে টারম্যাকে দাঁড়িয়ে নরেন্দ্র মোদীকে অভিবাদন জানান ইজরায়েলের ধর্মীয় নেতারা। পরের কয়েকদিনে সবাই দেখলেন একটা খুবই অন্তরঙ্গ সম্পর্ক যেন আলমারি খুলে বেরিয়ে এল এবং এমন এক মাত্রায় পৌঁছল যেখানে যুদ্ধবাজ বা যুদ্ধবাজদের দেখানো জুজুর কোনও স্থান নেই। অনেকেই অবাক হয়েছিলেন। যদিও দুই নেতাই সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ, বৌদ্ধিক আদান প্রদান এবং প্রতিরক্ষা বিষয়ক নানা বিষয়ে কথা বলেছেন। আগামী দিনে দুই দেশ এইসব ক্ষেত্রে যৌথভাবে কাজ করবে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। ভারতের তরফ থেকে জানানো হয়, ইজরায়েল হলো একমাত্র দেশ যার সঙ্গে ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিয়ে চুক্তি হয়েছে। আগামীদিনে ইজরায়েলের প্রযুক্তি এবং জ্ঞান পুলিশি ব্যবস্থার একেবারে মূলে পৌঁছে যাবে।

জল দুই দেশের কাছেই জাতীয় নিরাপত্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। প্রকৃতপক্ষে জল নিয়ে সদর্থক কিছু করে ওঠার আগে থেকেই একথা দুই দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ভারতে যেসব মানুষ কৃষিকাজ করতে গিয়ে অসুবিধা ও ক্ষতির সম্মুখীন হন তাদের ক্ষেত্রে ইজারায়েলের কৃষিজ্ঞান রক্ষাকবচ হয়ে উঠতে পারে। ভারতের আদিম, প্রায় নিয়ানডারথাল যুগের কৃষিপদ্ধতিতেও আসতে পারে যুগান্তর। ভারত এবং ইজরায়েলের মধ্যে সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা খুব সুন্দরভাবে নথিবদ্ধ করা হয়েছে এই



সফরে।

প্যালেস্টাইনকে ভারতের উপেক্ষা ইজরায়েলের দিক থেকে যতটা গুরুত্বপূর্ণ, ভারতের দিক থেকে ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ ইজরায়েলের পাকিস্তানকে উপেক্ষা। এই কূটনৈতিক পরীক্ষায় ভারত সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে। কিছুদিন আগে মহম্মদ আব্বাস নামে এক ব্যক্তি ভারতের সরকারি অতিথি হয়ে এদেশের এসেছিলেন। এই ঘটনা ভারতের দায়বদ্ধতা যেমন প্রমাণ করে ঠিক তেমন ভাবে আব্বাসের ভবিষ্যতকেও দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করে। ব্রুকিংসের মার্টিন ইনডাইক সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন, আমেরিকা এবং ভারত যদি আব্বাসকে ঠাঁই না দিত তাহলে আরব দেশগুলো তার চরম দুর্দশা করে ছাড়ত।

একটা কথা এখনই বলে দেওয়া যায়, ভারত ইজরায়েলের কাছ থেকে অত্যাধুনিক কৃষি ও জলপ্রযুক্তি তো পাবেই, সেই সঙ্গে ইজরায়েলের বিখ্যাত সাংস্কৃতিক সৃজনশীলতা, নিরাপত্তা ও সামরিক প্রযুক্তিরও অংশীদার হয়ে উঠবে ভারত। ইজরায়েলের সৃজনশীলতা সবসময়েই জীবন্ত থাকতে চায়। এই চাওয়া খুবই সদর্থক। কারণ সবাই যখন ডুবিয়ে দিতে চাইছে তখন নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার দায় নিজেকেই নিতে হয়। ভারতেরও তো এমন একজন বন্ধুকে দরকার যে সবসময় জীবন্ত, প্রাসঙ্গিক।

এখন প্রশ্ন হলো ইজরায়েল ভারতের কাছ থেকে কী পেল? এ প্রশ্নের সহজ উত্তর হলো, একটি বিশাল বাজার এবং অল্পবয়েসি ছেলেমেয়েদের ছুটি কাটানোর জন্য আদর্শ একটি জায়গা। ইজরায়েলের প্রযুক্তিবিদেরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের প্রতিটি অত্যাধুনিক উদ্ভাবন বিক্রি করে দেবার ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত। আবার বাজারে নতুন কোনও প্রযুক্তি এলে তা পকেটস্থ করার ব্যাপারে ভারতীয়দের জুড়ি মেলা ভার। এমনকী জিনিস ভালো হলে ক্রয়ক্ষমতার বাইরে যেতেও ভারতীয়দের আপত্তি নেই।

এ বছর শেষ হবার আগেই ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানেয়াহু ভারতে আসবেন। দেশের উন্নতির স্বার্থে আরও গুরুত্বপূর্ণ কী করা যেতে পারে সেটা এখনই ভেবে রাখতে হবে। অসামরিক ক্ষেত্রে পারমাণবিক শক্তির প্রয়োগ— ভারতের পরবর্তী কর্মসূচি হতে পারে।

বিশ্বের রাজনৈতিক অঙ্গনে ভারত ইজরায়েলকে স্বাভাবিক করে তুলছে। ঠিক যেভাবে জাপানকে করেছিল। ঐতিহাসিক ভাবে প্রতিবন্ধী এই দুই দেশের কাছে ভারত মানে একটা মুক্তির অনুভূতি। ভারতে কখনও কোনও ইহুদিকে ধর্মীয় কারণে নির্যাতন করা হয়নি। জাপানও হয়ে ওঠেনি শত্রুদেশ। তাই চীন ইজরায়েলের বৃহত্তম বাণিজ্য সহযোগী এবং বিনিয়োগকারী দেশ হলেও, ভারতের সম্ভাবনা চীনের থেকে অনেক বেশি।

এ বছর শেষ হবার আগেই ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানেয়াহু ভারতে আসবেন। দেশের উন্নতির স্বার্থে আরও গুরুত্বপূর্ণ কী করা যেতে পারে সেটা এখনই ভেবে রাখতে হবে। অসামরিক ক্ষেত্রে পারমাণবিক শক্তির প্রয়োগ— ভারতের পরবর্তী কর্মসূচি হতে পারে। আরও যেসব সম্ভাবনা অঙ্কুরোদ্গমের অপেক্ষায় দিন গুণছে এখনই তাদের চিহ্নিত করা প্রয়োজন।

(সৌজন্যে : টাইমস অব ইন্ডিয়া)



ইজরায়েলে ধর্মীয় নেতাদের অভ্যর্থনা মোদীর।

মেঃ জেঃ কে. কে. গঙ্গোপাধ্যায় (অব)



ইজরায়েল অ্যারোস্পেস প্রদর্শনী ঘুরে দেখছেন নরেন্দ্র মোদী

প্রধানমন্ত্রীর ইজরায়েল সফরের তাৎপর্য

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাম্প্রতিক ইজরায়েল সফর এক অভূতপূর্ব সাফল্যের নজির হয়ে রইল। স্বাধীন ভারতের কোনো প্রধানমন্ত্রী এর আগে ইজরায়েল সফরে যাননি। তিনি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন একবার ইজরায়েল সফর করেছিলেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ও একবার ইজরায়েল ও প্যালেস্টাইন সফর করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর এই সফর ভারত ও ইজরায়েলের বন্ধুত্ব ও বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। তিনি মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন বন্ধুরাষ্ট্র সফর করে সবশেষে ইজরায়েলে পৌঁছান। সমস্ত কূটনৈতিক নিয়ম কানুন দূরে সরিয়ে রেখে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বিমানবন্দরে নিজে এসে তাঁকে স্বাগত জানান। সম্পূর্ণ সফরে তিনি নিজে সব সময় মোদীজীর সঙ্গেই ছিলেন।

এই সফরে ভারত ও ইজরায়েলের মধ্যে সাতটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তার মধ্যে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চুক্তি ছাড়াও সামরিক যুদ্ধাস্ত্র ভারতে রপ্তানিরও চুক্তি রয়েছে।

কিন্তু এই সফর ও যুদ্ধাস্ত্র সম্পর্কিত চুক্তির জন্য ভারতে বেশ কিছু সমালোচনারও ঝড় উঠেছে। অনেকে প্রশ্ন করছেন, প্রধানমন্ত্রী যখন ইজরায়েলে গেলেন তখন জেরুজালেম থেকে রামাল্লা সফরে কেন গেলেন না। উভয় পক্ষের সঙ্গেই ভারতের সুসম্পর্ক রয়েছে। প্যালেস্টাইন ও ইজরায়েলের মধ্যে বিরোধে ভারত প্যালেস্টাইনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে তাদের স্বাধীনরাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার কথা বহুদিন আগে থেকেই বলে এসেছে। তাহলে রামাল্লা সফর না করায় ভারতের নীতি একতরফা হয়ে গেল।

অপরদিকে কিছু বিশেষজ্ঞ প্রশ্ন তুলেছেন ভারতের 'ডি আর ডি ও' (ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন) যেসব যুদ্ধাস্ত্র (মিসাইল, রকেট, হাল্কা যুদ্ধবিমান ইত্যাদি) ভারতীয় প্রযুক্তিতে (যেমন আকাশ মিসাইল তেজাস বিমান ইত্যাদি) নির্মাণ করতে সমর্থ হয়েছে, সেই সব ক্ষেত্রে ওই ধরনের মিসাইল এবং র‍্যাফেলের মতো ব্যয়বহুল যুদ্ধবিমান বিদেশ থেকে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করে কেন আমদানি করা হবে? ইজরায়েল আগেও অত্যাধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তির অস্ত্র-উপকরণ দিয়ে ভারতকে সাহায্য করেছে।

এই সফরে যেসব চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে তার মধ্যে ভারতে জলসংরক্ষণের প্রযুক্তি, উত্তরপ্রদেশে জলসরবরাহ ব্যবস্থায় উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, শিক্ষা ও গবেষণার বিষয়ে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে আদান-প্রদান, ভারত থেকে কৃত্রিম ছোট উপগ্রহ রপ্তানি এবং জিও লি অপটিক্যাল লিঙ্ক ইজরায়েল থেকে ভারতে রপ্তানি, ভারত-ইজরায়েল সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত চুক্তি, অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক চুক্তিগুলির সারবত্তা সহজেই বোধগম্য। কিন্তু যুদ্ধাস্ত্র সংক্রান্ত চুক্তিগুলির ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

ভারতের দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের উন্নয়নের বাধা হয়ে রয়েছে। পাকিস্তান রাষ্ট্র ভারতের অঙ্গচ্ছেদ করেই গঠিত হয়েছে এবং সেই স্বাধীনতার প্রথম উষা থেকেই ভারতের বিরুদ্ধে সামরিক আক্রমণ করে চলেছে। উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ কাশ্মীর তাদের চাই। বর্তমানে ভারতের বিরুদ্ধে জেহাদি জঙ্গিদের ভারতে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছে। কাশ্মীর আজ অগ্নিগর্ভ। তার দোসর হয়েছে চীন। পাকিস্তানের এই সন্ত্রাসবাদকে সে সমর্থন ও সাহায্য করে চলেছে। পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের মধ্য দিয়ে রাস্তা নির্মাণ করে 'গদর' নৌবন্দর পর্যন্ত পণ্য চলাচলের ব্যবস্থা করেছে। পাক সরকার ৪০ বছরের জন্য ওই বন্দর চীনকে ইজারা দিয়েছে। অন্যদিকে চীন ভুটানের 'ডোকালা'য় রাস্তা নির্মাণ করে চুম্বিভ্যালিতে ভারত-তিব্বত (চীন) ও ভুটান সীমান্তের সংযোগস্থল পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার প্রয়াস করে সৈন্যদল পাঠিয়েছে। তারা ভুটানের পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তে যথাক্রমে প্রায় ৫৯৫ ও ২৪৫ বর্গকিমি অঞ্চল চীনের ভূখণ্ড হিসাবে দাবি করে চলেছে। বাধ্য হয়ে নির্মাণে বাধা দিতে হয়েছে। চীনের প্রশ্ন ভারত কেন



ভুটানের হয়ে প্রতিবাদ করবে, সৈন্য পাঠাবে? প্রায় একমাস হতে চলল উভয় পক্ষের সৈন্যরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে। চীন ভারতকে হুমকি দিয়ে ১৯৬২-র কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। সৈন্য সরিয়ে না নিলে পস্তাতে হবে। ভারত বলেছে নৈব নৈব চ। দু-পক্ষের মুখ রক্ষা করে কীভাবে এই পরিস্থিতির শান্তিপূর্ণ সমাধান হবে কারও ধারণা নেই। যদি চীন সামরিক শক্তি ব্যবহার করে ভারতীয় সৈনিকদের হটিয়ে দিতে চায়, ভারতও চুপ করে থাকবে না। ১৯৬২-র পুনরাবৃত্তি হতে দেবে না। কিন্তু ভারত এত দ্রুত এমন একটা সম্ভাবনার জন্য প্রস্তুত নেই। বিমান বাহিনী স্থলবাহিনীর অনেক ক্ষেত্রে প্রচুর কমজোরি রয়েছে। লড়াকু বিমানগুলি প্রায় ২৫-৩০ বছরের পুরাতন, পার্বত্য যুদ্ধের জন্য অনুকুল কামান বাহিনীও এখনও নেই। সীমান্ত সড়কগুলি আজও সম্পূর্ণ হয়নি। পাহাড়ে আক্রমণ যোগ্য নতুন কোর এখনও প্রস্তুত নয়। এমতাবস্থায় ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রক নড়েচড়ে বসতে বাধ্য হয়েছে। যদি অবস্থা সীমান্ত যুদ্ধের দিকে অগ্রসর হয়, তা হলে ভারতের হাতে মোটেই সময় নেই।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে হবে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ইজরায়েল সফরে চুক্তিগুলির যৌক্তিকতা। কেন স্বল্প ও মধ্যম দূরত্বে 'শ্যাম' ক্ষেপণাস্ত্রগুলি এবং দ্রুত কার্যকরী মিশাইল (কুইক রিয়াক্সন) আমদানি করার দরকার পড়ল? কেনই বা 'র‍্যাফেল' যুদ্ধবিমান ফ্রান্স থেকে বেশি মূল্য দিয়ে আমদানি করতে বাধ্য হলো? প্রধানমন্ত্রীর 'ভারতে নির্মাণ কর' নীতি এবার কেন ব্যবহার করা গেল না।

ইজরায়েল সবসময়ই ভারতের প্রয়োজনের সময় এসেছে, যেমন কার্গিল যুদ্ধ। ভারতের পরম বন্ধু সোভিয়েত ইউনিয়ন আজ আর নেই, রাশিয়ার ক্ষমতাও সীমিত। এমতাবস্থায় ভারত কোনদিকে তাকাবে? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে পাক ভূখণ্ড থেকে সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করার জন্য চাপ দিচ্ছে, কিন্তু এতদিন সন্ত্রাসবাদ শেষ করার জন্য শত শত বিলিয়ন ডলার দান করেছে, তার সবটাই পাকিস্তান ছায়াযুদ্ধ চালাতেই খরচ করেছে। তাদের থেকে কোনো তাৎক্ষণিক সাহায্য আশা করার পরিস্থিতি নেই। ভারতের প্রধানমন্ত্রী কোনো পক্ষকেই বিক্ষুব্ধ না করে, ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নিতানিহায়ুর সঙ্গে চুক্তি করে অবস্থা সামাল দেওয়ার প্রয়াস করেছেন। আশা করব চীন-ভারত সীমান্তে উত্তাপ কূটনৈতিক আদান প্রদানের মারফৎ শান্ত হবে। কিন্তু চীন তিব্বতে সত্যিকারের গোলাগুলি চালিয়ে তাদের সৈন্যদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। শোনা যায় দার্জিলিং, সিকিম এবং কাশ্মীরেও তাদের হাত রয়েছে। এমতাবস্থায় ভারতকে তাৎক্ষণিক ভাবে হয়তো অবাঞ্ছিত যুদ্ধের পরিবেশে পড়তে হতে পারে। মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্ব এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে। এই রাষ্ট্রগুলি ইজরায়েলের বিপক্ষে প্যালেসস্টাইনকে সমর্থন করে। সেই জন্য যাতে তারা বিরূপ না হয়, সেইদিকে লক্ষ্য রেখে মোদীজী প্রথমে ওই রাষ্ট্রগুলি সফর করে সবশেষে ইজরায়েলে পদার্পণ করেছেন। মনে রাখতে হবে চীন-ভারত সম্পর্কের অবনতি ঘটলে অন্য শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির কেউই ভারতের পাশে এসে দাঁড়াবে বলে মনে হয় না। ভারতকেই নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রীয় স্বার্থ রক্ষা করতে হবে। ভারতের সামরিক বাহিনীর যা প্রয়োজন তার প্রায় সবই ইজরায়েলের কাছে ব্যবহার করার অবস্থায় প্রস্তুত রয়েছে। সঠিক মূল্য দিলে তারা সেইসব সামগ্রী ভারতে পৌঁছে দেবে।

জাতি হিসাবে ইহুদিদের মনে একটা কঠোর ভাব আছে, তারা শক্তিধর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাদের সীমিত শক্তি নিয়ে দাঁড়াতে ভয় পায় না। ...আজ ভারত ও তার সামরিক বাহিনীকে সেই মনোভাব নিয়ে আগ্রাসী মহাশক্তিধর প্রতিবেশীর সামনে দাঁড়াতে হবে।

আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে, জাতি হিসাবে ইহুদিদের মনে একটা কঠোর ভাব আছে, তারা শক্তিধর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাদের সীমিত শক্তি নিয়ে দাঁড়াতে ভয় পায় না। ইজরায়েলের বিমান চুরি করে (হাইজ্যাক) নিয়ে গিয়ে পণবন্দী করা হয়েছিল অনেক বছর আগে, তারা কীভাবে তাদের পণবন্দি নাগরিকদের উদ্ধার করেছিল, 'এনটেবের' সেই ঘটনা সকলেরই জানা আছে। আজ ভারত ও তার সামরিক বাহিনীকে সেই মনোভাব নিয়ে আগ্রাসী মহাশক্তিধর প্রতিবেশীর সামনে দাঁড়াতে হবে। চীন-ভারত পঞ্চশীল চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল কিন্তু তারপর থেকে চীন সেই চুক্তির একটি অক্ষরও মেনে চলেনি। নাগা, মিজো, উলফা জঙ্গিদের অস্ত্র, আশ্রয়, প্রশিক্ষণ দিয়ে এসেছে, আজও উলফার পরেশ বড়ুয়া এবং কোনো কোনো নাগা ও মণিপুরের সন্ত্রাসবাদীদের সাহায্য দিয়ে চলেছে। চীনের দার্শনিক সুনজুরের নির্দেশ মতো চীনের সীমার বাইরে যেসব দেশ রয়েছে, তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেই চীনের অন্তর্ভুক্ত করতে চায়।■

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

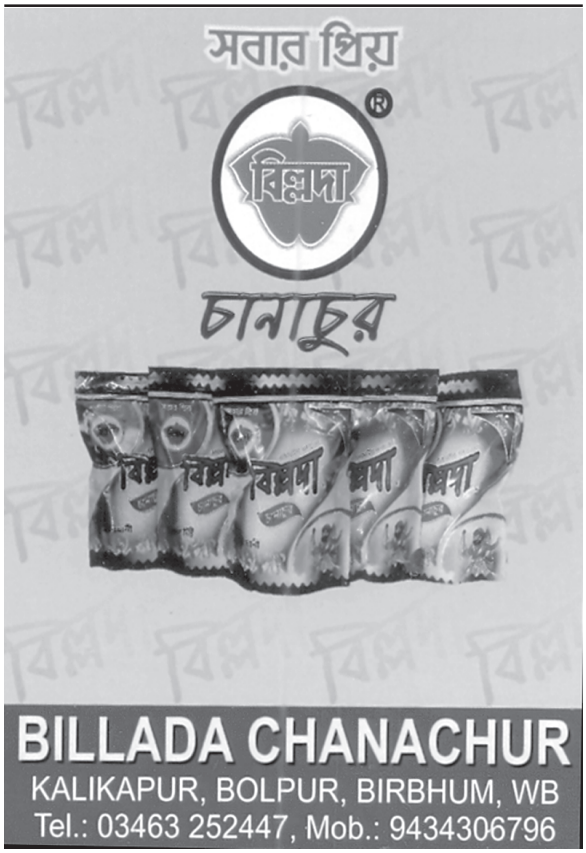

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

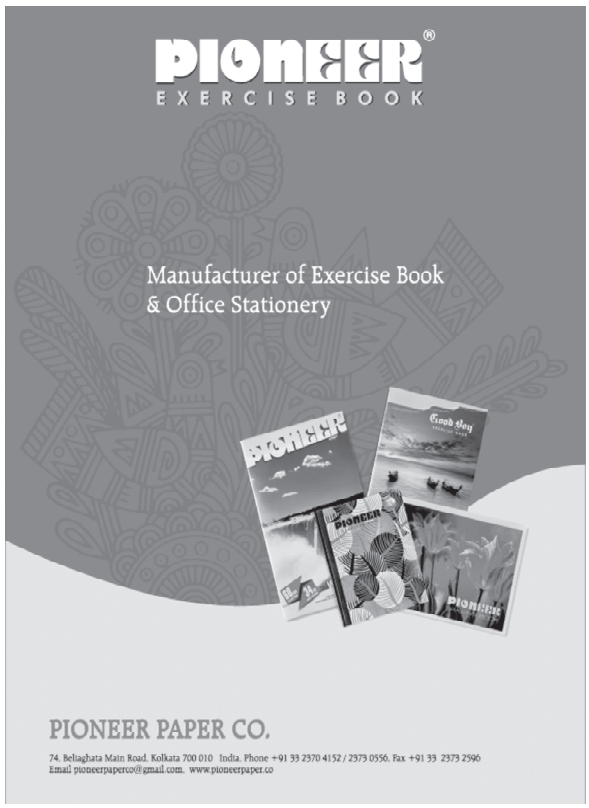

পঞ্চাশ বছর ধরে নকশালরা কার স্বার্থে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত?



নকশালবাড়ি গ্রামের একটি বাড়িতে কার্ল মার্কসের অবহেলিত ছিন্ন চিত্র।

সাধন কুমার পাল

দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দেওয়ালে একটি পোস্টার দেখে আমি ফিরে গিয়েছিলাম আমার শৈশবের দিনগুলিতে। মনে পড়ছিল এক বৃদ্ধের তীর্থ দর্শনের আকুতির কথা। DSU-এর পক্ষ থেকে লাগানো ওই পোস্টারে লেখা ছিল NAXALBARI. I know this simple word of four syllables is not just the name of a village, but the name of the whole country ! ভাষা থেকে স্পষ্ট এক শ্রেণীর মানুষের কাছে নকশালবাড়ি তীর্থক্ষেত্র। ভাবছিলাম তীর্থ মানে তো সেই ভূমি যা মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে, সমৃদ্ধ হতে, মানবকল্যাণে ব্রতী হতে প্রেরণা জোগায়।

তখন আমার বয়স সম্ভবত ছয় সাত বছর। প্রতিবেশী হতদরিদ্র পরিবারের অশীতিপর বৃদ্ধের ভজন কীর্তনের একটি লাইন আমাকে ভীষণ কল্পনাপ্রবণ করে তুলতো। ওই সঙ্গীতের একটি লাইন হলো '...গুরু বৃন্দাবনে যাবো কোন পথে, গুরু বৃন্দাবনে যাব কোন পথে...'। আমার মতো ওই বৃদ্ধের কথা প্রতিবেশীরা অনেকেই মনে রেখেছেন। কারণ ওই বৃদ্ধ কৃষ্ণের লীলাভূমিতে যেতে না পারলেও তিনি মানুষের মধ্যেই কৃষ্ণদর্শন করতেন, সুযোগ পেলেই সামর্থ্য অনুসারে ঈশ্বরজ্ঞানে মানুষের সেবা করতেন। ভাবছিলাম এই নকশালদের মধ্যেও কি ওই বৃদ্ধের মতো তীর্থদর্শনের আকুতি আছে?

নানা ভাবে খোঁজ নিয়ে বিষয়টি বুঝে ওঠার চেষ্টা করলাম। খোঁজ নিতে যা জানলাম সেটা চমকে ওঠার মতো। যত জনের কাছে জানতে চেয়েছি সবার একটিই মত— যারা এই পোস্টার লাগিয়েছে সমগ্র ভারতবর্ষ তাদের চেনে। টেলিভিশনের দৌলতে মানুষ দেখেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে দাঁড়িয়ে



কানু সান্যাল।

সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা আয়োজনের নামে ওরা বুক ফুলিয়ে স্লোগান তুলছে 'ভারত তেরে টুকরে হোঙে ইনসাআল্লা ইনসাআল্লা, কাশ্মীর মাঙে আজাদী, আসাম মাঙে আজাদী, নাগাল্যান্ড মাঙে আজাদী, ভারত কী বর্বাদি তক জং রহেগি জং রহেগি, আবজাল হাম শর্মিন্দা হ্যায় তেরে কাতেল জিন্দা হ্যায়...'। দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়া চলার পর সুপ্রিম কোর্টের রায়ে আফজাল গুরু, ইয়াকুব মেননের ফাঁসি হলেও মিডিয়ার দৌলতে মানুষ দেখেছে জেএনইউ-এর অতি বিপ্লবী গ্যাং এই ফাঁসির ঘটনা 'জুডিশিয়াল কিলিং' বলে তুলে ধরতে চাইছে। এমন সব স্লোগান তুলছে যার অর্থ ভারতকে ধ্বংস করার জন্য একদিন ঘরে ঘরে জন্মাবে আফজাল ইয়াকুবেরা। ইতিহাস বলছে দেশভাগের সময়ও কমিউনিস্ট নেতারা দাবি করেছিলেন জাতিসত্ত্বার ভিত্তিতে ভারতকে বহু ভাগে ভাগ করতে হবে। পাকিস্তানকে বঞ্চিত করা হয়েছে। সুভাষ চন্দ্র বসু গান্ধীজী থেকে শুরু করে কোনো জাতীয় নেতাই রেহাই পাননি কমিউনিস্টদের কুৎসার হাত থেকে। সব শুনে মনে হচ্ছিল জেএনইউ-এর এই অতিবিপ্লবীরাই ভারতের কমিউনিস্ট নেতাদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী।

যারা এই অতি বিপ্লবীদের কাছ থেকে চেনেন তাঁরা বলছেন ছত্তিশগড়ের জঙ্গলে, কাশ্মীরে সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানদের বুলেটে কোনো সন্ত্রাসবাদীর মৃত্যু হলে এরা মানবাধিকার লঙ্ঘনের নামে সোচ্চার হয়। সন্ত্রাসবাদীদের বুলেটে সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানদের বড় ক্ষয়ক্ষতি হলে এই ছাত্রেরা ক্যাম্পাসে বিজয় উৎসব পালন করে।

নকশাল আন্দোলনের ৫০ বছর পূর্তির ঠিক একমাস আগে ২৪ এপ্রিল (২০১৭) বস্তারের সুকমায় সশস্ত্র নকশাল বাহিনীর আক্রমণে ২৫ জন সিআরপিএফ জওয়ান প্রাণ হারিয়েছেন, ছয় জন গুরুতর আহত হয়েছেন। রিপোর্ট বলছে দেশের নকশাল-অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে আমজনতার স্বার্থে যে-কোনো ধরনের উন্নয়ন প্রকল্পের কাজের জন্য প্রাণ হাতে নিয়ে কাজ করতে হয় শ্রমিক ঠিকাদার-সহ সমস্ত উন্নয়ন কর্মীদের। ফলে সরকারকে কড়া নিরাপত্তার আয়োজনের কথা ভাবতে হয়। ছত্তিশগড়ের বস্তার জেলার সুকমাতেও ৭০০ কিলোমিটার রাস্তা, স্কুলবাড়ি নির্মাণ, আধুনিক হাসপাতাল নির্মাণের মতো পরিকাঠামো উন্নয়নে চলা ব্যাপক কর্মযজ্ঞে নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন হতভাগ্য এই সিআরপিএফ জওয়ানেরা।

এই সমস্ত ধ্বংসাত্মক কাজের পেছনে তাত্ত্বিক নকশালরা সর্বহারাদের সীমাহীন বঞ্চনাজাত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ বা নিরাপত্তারক্ষীদের দ্বারা আমজনতার নির্যাতনের সেই আদি ও অকৃত্রিম অভিযোগ যত অকাট্য যুক্তির জাল বিস্তার করে পেশ করুন না কেন এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপ থেকে এটা স্পষ্ট যে নকশাল আন্দোলনের মূল পুঁজি অনাহার অবহেলা অনুন্নয়ন অশিক্ষা। কোনো রকম উন্নয়ন প্রয়াসের মাধ্যমে এই 'পুঁজি' ধ্বংস হোক এটা নকশালপন্থীরা চায় না। গত পঞ্চাশ বছর ধরে দেশের আমজনতা নকশালদের সম্পর্কে এই সত্য অনুভব করেছে বলেই এই অতিলাল ভাবধারা এখনো গভীর জঙ্গল ছেড়ে মূলস্রোতে জায়গা করে নিতে পারেনি।

সর্বশেষ সরকারি রিপোর্ট বলছে পশ্চিমবঙ্গের আটটি জেলা-সহ দেশের ৬০টি জেলা নকশাল উপদ্রুত। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ এই অতিলাল উগ্রপন্থাকে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার পক্ষে সবচেয়ে বড় বিপদ বলে চিহ্নিত করেছেন। তথ্য জানার অধিকার আইনের একটি প্রশ্নের উত্তরে দিল্লির স্বরাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে, ১৯৯৩ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত ৯৪৭১ জন আমজনতা ও ২৭১২ জন কেন্দ্র ও রাজ্যের নিরাপত্তারক্ষী-সহ মোট ১২১৮৩ জন নকশাল আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছেন। ভারতের নকশাল আন্দোলনের ফলস্বরূপ এই রক্তপাত কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। স্টিফেন কোর্টোইস (Black Book on Communism : Crims, Terror, Repression, first published in France in 1997, was edited by noted European academician Stephen Courtois) প্রদত্ত পরিসংখ্যান--- বিশ্বে কমিউনিস্ট আন্দোলন সংগঠিত করতে গিয়ে ৯৪ মিলিয়ন মানুষকে হত্যা করা হয়েছে।

কেন এত রক্তপাত? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে চোখ আটকে যায় মাও জেদুঙ-এর সেই কুখ্যাত উক্তিতে— 'It is necessary to create terror for a while in every rural area, or otherwise it would be impossible to suppress the activities of the counter-revolutionaries...' ভারতেও সমস্ত ব্র্যান্ডের লাল অতিলাল কমিউনিস্টদের যাবতীয় অপকর্মের প্রেরণা যে মাও জেদুঙ-এর এই পথনির্দেশ এ বিষয়ে বোধহয় খুব একটা সন্দেহের অবকাশ নেই।

নকশাল শব্দটি এসেছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের একটি ছোটগ্রাম 'নকশালবাড়ি' থেকে। বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল ১৯৬৭ সালের ২৫ মে। সে সময় নকশালবাড়ি গ্রামের কৃষকদের উপর স্থানীয় জোতদাররা ভাড়াটে গুণ্ডার সাহায্যে অত্যাচার করছিল। চারু মজুমদার মাও জেদুং-এর অনুসারী ছিলেন।



মাওবাদী মদতপুষ্ট খোলাইয়ের শিকার বনবাসী মেয়েরা।

তিনি নকশালবাড়ি আন্দোলনকে সারা দেশে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তার লেখনীর মাধ্যমে। তার বিখ্যাত 'হিস্টোরিক এইট ডকুমেন্টস্' বা আট দলিল যা নকশাল মতাদর্শের ভিত্তি রচনা করে।

পশ্চিমবঙ্গে ছাত্রসমাজের একটি বড় অংশ লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে নকশালের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়েছিল। নকশালপন্থী ছাত্ররা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় দখল করে নিয়ে তার মেশিন শপে পুলিশের সঙ্গে লড়ার জন্য আগ্নেয়াস্ত্র তৈরি করেছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজ ছিল তাদের সদর দপ্তর। সে সময় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ গোপাল সেনকে হত্যার পরিকল্পনাও হয়েছিল। এই সমস্ত ধ্বংসাত্মক কাজের জন্য দেশবাসীর কাছে নকশালদের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়ে যায়, আর তাদের প্রতি সহানুভূতিশীলরাও মুখ ফিরিয়ে নেয়। এরপর সরকার নকশালদের শক্ত হাতে দমনের সিদ্ধান্ত নেয়। এক মাসের ভেতরে সরকার নকশাল আন্দোলন দমন করেছিল।

এছাড়া অন্তর্কোন্দলের কারণে আন্দোলনে ছেদ পড়ে। ১৯৭২ সালে চারু মজুমদার পুলিশের হাতে ধরা পড়েন এবং আলিপুর জেলে নিহত হন। প্রধান নেতৃবর্গের বড় অংশই জেলবন্দি হন। পরে নকশালপন্থী দল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী), বহু ধারা উপধারায় বিভক্ত হয়ে যায়। অনেক বছর পরে এই আন্দোলনের



চারু মজুমদার

অন্যতম প্রধান নেতা কানু সান্যাল ৭৮ বছর বয়সে ২০১০ সালের ২৩ মার্চ পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ি থানার হাতিঘিষা গ্রামের নিজ বাড়িতে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

এই আন্দোলনের ৫০ বছর পূর্তির খবর সংবাদ মাধ্যমে আসতে শুরু করার পরই মনে হয়েছিল যে, বোঝা দরকার কেন এই মাটি থেকে দেশের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন মূর্তিমান আতঙ্কের প্রতীক, জাতীয় সম্পদ ধ্বংসকামী, মেধাবী যুবক যুবতীদের বিপথে চালনাকারী এমন একটি আন্দোলনের জন্ম হলো যা পঞ্চাশ বছর পরেও দেশের বিভিন্ন স্থানে নিরপরাধ মানুষের রক্ত ঝরাতে বদ্ধপরিকর, দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার পক্ষে সবচেয়ে বিপজ্জনক শক্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

বাঙলার মাটিতে যখন নকশাল আন্দোলন আছড়ে পড়ে ছিল তখন ওদের স্লোগান ছিল চীনের চেয়ারম্যান আমার চেয়ারম্যান, ভুলে যাব বাবার নাম ভুলবো নাকো ভিয়েতনাম। পঞ্চাশ বছর পরেও এরা ইসলামি জেহাদিদের সঙ্গে মিলে পাকিস্তান জিন্দাবাদ হিন্দুস্থান মুর্দাবাদ ধ্বনি তুলছে, সমস্ত ভারত বিরোধী বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসবাদী শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে চীনা ষড়যন্ত্রের ক্রীড়নক হয়ে কাজ করছে। ক্ষুধা দারিদ্র্য বেকারি শোষণ বঞ্চনার অভিশাপের বিরুদ্ধে লড়াই বিশ্বের কোথায় নেই। লড়াই লড়াই লড়াই চাই স্লোগান তোলা কমিউনিস্ট পার্টিগুলি তাদের শাসনে থাকা তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে এই অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে পেরেছে এমন নজির নেই। কমিউনিস্ট পার্টিগুলি বিশ্বকে এই ব্যাধি মুক্তির পথে সামান্য দিশা দিতে পেরেছে এমন কথা এই মতের অন্ধ সমর্থকেরাও বলবেন না। নকশালবাড়ি গিয়ে ঠিক করলাম হাতীঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের সেই সেবদুল্লা জোতেই যাব যেখানে কানু সান্যাল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। গ্রামের পথে হাঁটতে হাঁটতে গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে মনে হলো ৫০ বছর আগে যে কারণগুলির জন্য বঞ্চিত মানুষের ক্ষোভকে পুঁজি করে চারু মজুমদার, কানু সান্যাল, জঙ্গল সাঁওতালদের মতো অতিলাল ভাবধারার কমিউনিস্ট নেতারা ধ্বংসাত্মক আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন



ছত্তিশগড়ে মাওবাদী নিধনযজ্ঞ।

সেই কারণগুলি এখনো বর্তমান। সেই পঞ্চাশ বছর আগের জোতদার না থাকলেও গরিব মানুষের হাতে জমি নেই। বহুগুণ লাভের আশায় জমি ব্যবসায়ীরা জমি কিনে পতিত ফেলে রেখেছেন। সরকারি পরিসংখ্যান যাই বলুক না কেন একনজর দেখলেই বোঝা যায় স্বাধীনোত্তর ভারতে সরকারের বিভিন্ন দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচির ছাপও এখানে পড়েনি।

বিভিন্ন কথার মাঝে প্রশ্ন করাতে নকশাল আন্দোলনের বিষয়টি শুনেছি বলে অনেকেই পাশ কাটালেন বা পাত্তা দিলেন না। আবার যারা বিষয়টি জানেন বলে মনে হলো তাদের মধ্যেও এই আন্দোলনের ব্যাপারে কোনো আবেগ অনুভূতি প্রত্যাশা লক্ষ্য করা গেল না। দেখলাম দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে এখনো বেঁচে আছেন জঙ্গল সাঁওতালের স্ত্রী বাহামনী সাঁওতাল। প্রশ্ন করে জানা গেল এই আন্দোলনের উত্তরসূরিরা কেউ খোঁজ করে না। কথা হলো একদা কানু সান্ন্যালের ছায়াসঙ্গিনী বলে পরিচিত [CPI(ML) Founder General Sec Kanu Sannyal Organisation] দলের দার্জিলিং জেলা সম্পাদিকার সঙ্গে। জানালেন কানু সান্ন্যালের মতে জনজাগরণের মাধ্যমেই বিপ্লব আসবে। নকশাল আন্দোলনের ব্যর্থতা নিয়ে প্রশ্ন করাতে জানালেন চারু মজুমদার প্রদর্শিত হিংসার পথে হেঁটেই আজ নকশাল আন্দোলনের এই দুর্গতি। মাওবাদী তকমায় তীব্র আপত্তি জানিয়ে বললেন হিংসা রক্তপাতের পথ ভুল। কথা হলো ৭৪ বছর বয়সী ৬৭ সালের ২৫ মে সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে নকশালবাড়ি অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া শান্তি মুন্ডার সঙ্গে। সে সময় শান্তি মুন্ডা ছিলেন ২৪ বছরের যুবতী। এখনো জমিতে কাজ করেন। তবে দেশ কাল সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখেন।

এখন জোতদার নেই। স্বাভাবিক ভাবেই জোতদারের শোষণ অত্যাচার কোনোটাই নেই। তাহলে কি বলতে হবে নকশাল আন্দোলনের প্রয়োজন ও প্রাসঙ্গিকতা কোনোটাই নেই? প্রতিবেদক এই প্রশ্ন করাতে শান্তি মুন্ডার জবাব— আগের জোতদার নেই। তবুও দেখুন না কত জমি ফাঁকা পড়ে আছে। এই সমস্ত জমির মালিক শিক্ষক ব্যবসায়ী ডাক্তারবাবুরা। এরাই এখন নতুন জোতদার। এখন আমাদের আন্দোলন এই নব্য জোতদারদের বিরুদ্ধে।

প্রশ্ন : পুলিশ মারো, পুঁজিপতিদের দালাল চিহ্নিত করে সাধারণ মানুষকে মেরে দেওয়ার যে নীতি এই আন্দোলনে নেওয়া হয়েছিল সে ব্যাপারে আপনার মতামত কী?

শান্তি মুন্ডা : এটা ছিল একটা বিরাট ভুল। আমরা অনুভব করেছি মানুষ মেরে কোনো আন্দোলন সফল হতে পারে না। ভুল নীতির জন্যই এই আন্দোলন দিশা হারিয়েছে।

প্রতিবেদক : এই যে আপনাদের এই সিপিআই (এমএল) দল গরিব মানুষকে বোঝাতে এই বুর্জোয়া ব্যবস্থার শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। সেজন্য নকশালরা স্কুলবাড়ি পোড়ায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে...

শান্তি মুন্ডা : না না আমি এটা বিশ্বাস করি না। এরকম কথা কেউ বলতে পারে না। এক সময় হয়তো এটা বলতো কিন্তু সেটা ছিল মস্ত বড় ভুল।

প্রতিবেদক : ভোটে দাঁড়াবেন?

শান্তি মুন্ডা : প্রয়োজনে ভোটে দাঁড়ানো যেতে পারে। তবে ভোটের মাধ্যমে পরিবর্তন সম্ভব নয়। ভিয়েতনামে ওইরকম পরিবর্তন হয়েছিল সেটা বেশিদিন টেকেনি। সেজন্য আমরা ভোটকে বিশ্বাস করি না। আমাদের একটাই লক্ষ্য, বিপ্লব।

অর্থাৎ রক্তপাত?

না না রক্তপাত নয়। মানুষকে বুঝিয়ে বিপ্লব আনতে হবে। তবে

আগে যত মানুষ ছিল এখন তেমন নেই।

সাঁইত্রিশ বছরের দল ভারতীয় জনতা পার্টি গণতান্ত্রিক পথে আপনারই মতন গরিব ঘরের একজন চা বিক্রেতার পুত্রকে প্রধানমন্ত্রী পদে বসিয়েছে। যিনি স্লোগান তুলছেন 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ'। 'দেশের সংবিধান পরিবর্তনের' মতো আপনাদের অধরা স্বপ্নও এখন বিজেপির ধরা ছোঁয়ার মধ্যে। এই ব্যাপারে আপনার মতামত কী?

শান্তি মুন্ডা : বিজেপি ভালো কাজ করলে আমাদের আপত্তি নেই। কিছুদিন আগে আহলুওয়ালিয়া এখানে এসেছিল। আমি যাইনি। পরে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেন, 'এই গ্রামে কানু সান্ন্যাল বাস করতেন। তিনি বলেছিলেন বুলেটের মাধ্যমে উন্নয়ন করবেন, কিন্তু আমি ব্যালটের মাধ্যমে উন্নয়ন করতে চাই।' আমি বলেছি খুব ভালো কথা। এরকম ভাবে উন্নয়ন হলে আমরা আপনাদের সঙ্গে আছি। নকশাল আন্দোলনের পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ দৃষ্টি নিয়ে নকশালবাড়ি ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়েও কোনো 'নকশাল'কে খুঁজে না পেয়ে হতাশ লাগলো। সেই ক্লান্তির মাঝে স্পষ্ট অনুভব করলাম দারিদ্র্য বঞ্চনা থাকা সত্ত্বেও আজকের নকশালবাড়ি ৬৭ সালের সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলি স্মরণ করতে চায় না। ফলে অতিলাল বা নকশাল ভাবধারার কারো কাছেই কোনো ভাবেই আজকের নকশালবাড়ি প্রেরণার উৎস নয়। এ কথার বড় প্রমাণ বোধহয় এটাই যে ৬৭-এর অভ্যুত্থানের অংশীদার কমরেড বাহামনী সাঁওতাল, শান্তি মুন্ডাদের নিয়ে আজকের নকশাল নামধারীদের কোনো আবেগ উচ্ছাস নেই। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে বর্তমান সময়ে যে নকশালদের কাছে 'নকশালবাড়ি' হলো এমন এক ভয়ঙ্কর মতাদর্শের নাম যেখানে দালাল বুর্জোয়া তকমা সেঁটে দিয়ে ধনী গরিব নির্বিশেষে যে-কোনো মানুষকে নির্বিচারে খুন করা যায়, বুর্জোয়া ব্যবস্থার তকমা সেঁটে দিয়ে স্কুল, কলেজ, সেতু, যানবাহন, সরকারি দপ্তরের মতো আমজনতার জীবন ধারণের জন্য ন্যূনতম পরিকাঠামোগুলি নির্বিচারে ভেঙেচুরে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেওয়া যায়, প্রকাশ্যে ভারতকে বরবাদ করার টুকরো টুকরো করার স্লোগান তোলা যায়, নিরপরাধ নিরাপত্তারক্ষীদের উপর প্রাণঘাতী হামলা থেকে শুরু করে দেশের 'বুর্জোয়া' ব্যবস্থার উপর যত রকমের আঘাত আক্রমণ সম্ভব তার সবটাই করা যায় তাদের প্রেরণার উৎসটা আসলে কী? ধর্মে অবিশ্বাসী হয়েও ভারত বিরোধী যুদ্ধে ইসলামিক জেহাদিদের মতো ধর্মযোদ্ধারাও এদের কাছে অচ্ছুৎ নয় কেন? তাহলে কি বলতে হবে যে নকশাল পরিচয়ের আড়ালে চীনের এজেন্টরা চীনের হয়ে ভারতের ভিতরে থেকে ভারতেরই বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে? নকশাল আন্দোলনের ৫০ বছর পূর্তিতে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা খুবই জরুরি। ■



মাওবাদীদের নতুনভাবে জেগে ওঠার নতুন অঞ্চল— এম এম সি

স্বপন দাস

মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর কোণঠাসা মাওবাদীরা বাঁচার রাস্তা খুঁজতে ব্যস্ত। সেই রাস্তা কোথায় হবে তাই নিয়ে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি অঞ্চলের প্রস্তাবও এসেছিল। অবশেষে সেই রাস্তা তারা তৈরি করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এরকমই একটি ২৫ পাতার মাওবাদীদের প্রমাণ্য পুস্তিকা এখন পুলিশের হাতে। এতদিন মাওবাদীরা তাদের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করত ছত্তিসগড়ের বস্তার বনাঞ্চল থেকে। কিন্তু নতুন কেন্দ্রীয় সরকার আসার পর তাদের সেই জায়গাটা থেকে উৎখাত করতে সমর্থ হয়েছে অনেকটাই। তাই নতুন করে এমন একটি রাস্তা তারা তৈরি করতে চায়, যেটা হবে দ্বিতীয় দণ্ডকারণ্য। এই নতুন অঞ্চলের কোড নাম এম এম সি (মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিসগড়)। আর এটিকে ইতিমধ্যেই বিশেষ অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করাও হয়ে গেছে মাওবাদী ম্যাপে।

এবার আসা যাক কেন মাওবাদীদের নতুন জায়গা খুঁজতে হলো। তার একটিই কারণ, যাদের দারিদ্র্যকে পাথেয় করে দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে, ভয় দেখিয়ে, নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল মাওবাদীরা, সেই প্রত্যন্ত অরণ্য অঞ্চলের জনজাতিরা এখন তাদের থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। একে একে কয়েকটি কেন্দ্রীয় প্রকল্পের কথা বলা যাক, যার কারণে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ উন্নয়নের মুখ দেখতে পাচ্ছে, রোজগারের দিশা দেখতে পেয়েছে।

১। যোগাযোগ আরও মসৃণ হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায়, ২। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর পাচ্ছে, ৩। ট্রাইবাল সাব প্ল্যান তৈরি হয়েছে বনবাসীদের সামাজিক উন্নয়নের জন্য, ৪। শিক্ষিত করে তোলার জন্য সর্ব শিক্ষা মিশনের অধীনে বিশেষ ব্যবস্থা, ৫। যুবক যুবতীদের বিভিন্ন পেশায় স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারার জন্য স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান, এছাড়াও রয়েছে ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কিম, ৬। পানীয় জলের সমস্যার সমাধান করার জন্য ন্যাশনাল রুরাল ড্রিঙ্কিং ওয়াটার প্রোগ্রাম আরও ত্বরান্বিত করেছে এই সরকার। ফলে ওই প্রত্যন্ত অঞ্চলের যে দুর্বলতাকে হাতিয়ার করে সরকারের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির পথকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সেখানে ধাক্কা এল। তাই মাওবাদীদের নতুন অঞ্চলের খোঁজ শুরু করতে হলো। এবং তা শুরু হয়েছে ২০১৬-র এপ্রিল মাস থেকে। তারা মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট, মহারাষ্ট্রের গন্দিয়া ও রাজনন্দনগাঁও এবং মুখ্যমন্ত্রী রমন সিংহের নিজের গ্রাম কবিরধাম ও ছত্তিশগড়ের মুঙ্গেলির সংলগ্ন যে অরণ্য অঞ্চল রয়েছে সেখানে গ্রামবাসীদের মধ্যে সরকার বিরোধী প্রচার শুরু হলো। মূলত অনুন্নয়ন, বেরোজগারি সঙ্গে নোটবন্দির কারণে মানুষের দুর্দশার কথাই তারা বলছে বেশি।

একজন সিনিয়র পুলিশ অফিসার জানিয়েছেন, যে এই এম এম সি হচ্ছে সেই অর্থে প্রথম একটি অঞ্চল যেটি খুব পরিকল্পনা করে মাওবাদীরা তৈরি করছে।

এর মধ্যেই তাদের কাজ কর্মের হদিশ ও তৎপরতা লক্ষ্য করেছে প্রশাসন। তারা জানিয়েছে যে গভীর বনাঞ্চলে চার পাঁচটি বড় আগুনের খবর তারা পেয়েছেন। যেটা মাওবাদীদের অবস্থানকে নির্দিষ্ট করে। সক্রিয়তার লক্ষণ হিসেবে পাওয়া গেছে বিভিন্ন জায়গায় অস্ত্র লুঠ, জওয়ান ও পুলিশ কর্মী খুন প্রভৃতি ঘটনা বাড়তি মাত্রায় ঘটতে থাকায়। উদ্ধার হওয়া মাওবাদী কাগজপত্রে আর একটি নির্দেশ খুব গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হলো এই অঞ্চলে রাজনৈতিক কার্যকলাপকে দ্রুত হারে বাড়িয়ে তোলা। অর্থাৎ স্থানীয় স্তরে কমিটি তৈরি করে দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া।

ওই কাগজপত্র থেকে আরেকটি বিষয় বেশ অবাক করেছে সবাইকে। যেটা হলো, এই অঞ্চলের কোনো ক্যাডার মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবে না। কারণ টাওয়ার দেখে লোকেশন খুঁজে নিতে পারে পুলিশ। তাই তারা আগুন জ্বালিয়ে সিগন্যাল দেবার ব্যবস্থা করেছে। আর দু' ঘণ্টার মধ্যে এলাকা ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যাবে বেফাঁস কিছু বুঝলেই। সেরকমই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গত মে মাসের ৮ এবং জুন মাসের ৮ তারিখে এই বিশেষ এম এম সি অঞ্চলের করিডোরে ছত্তিসগড় পুলিশ, আইটিবিপি, মধ্যপ্রদেশ পুলিশ একটি অভিযান চালিয়েছিল। কিন্তু তাদের এই ১৩ কিলোমিটার অভিযানে কোনো মাওবাদী উপস্থিতি চোখে পড়েনি। তারা জানিয়েছেন, এরকম টহলদারি চালিয়ে যাবেন প্রত্যেক মাসে। ■

এই সময়

মানবপদ্ম

দু' হাজার চারশো জন একসঙ্গে দাঁড়ালেন। ফুটে উঠল পদ্ম। এটাই মানুষের দেহাকৃতি



দিয়ে তৈরি বৃহত্তম পদ্ম। উদ্যোক্তা সানফ্রানসিসকোর এশিয়ান আর্ট মিউজিয়াম। ঘটনাটি গিনিস বুক অব রেকর্ডসে জায়গা পেয়েছে।

দিল্লিতে প্লাবন

সম্প্রতি প্রচণ্ড বৃষ্টিতে দিল্লির রাস্তাঘাটের চেহারা হয়েছিল নদীর মতো। সেই সঙ্গে গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো অস্বাভাবিক ট্রাফিক জ্যামে থমকে গিয়েছিল রাজধানী



শহর। মানুষের দুর্ভোগ যত বেড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায় রসিকতার বানও ডেকেছে পাল্লা দিয়ে। কেউ নিদান দিয়েছেন নৌকোর, কেউ বা সাবমেরিনের।

চাঁদের ধুলো

আমেরিকার নভশ্চর নিল আরমস্ট্রং চাঁদের যে ধুলো পৃথিবীতে এনেছিলেন সম্প্রতি নিউ ইয়র্কের এক নিলামে তা বিক্রি হয়েছে ১.৮



মিলিয়ন মার্কিন ডলারে। অর্থাৎ ১৮০ কোটি টাকায়। ধুলোভরা একটি ব্যাগ দীর্ঘদিন অশনাক্ত অবস্থায় পড়েছিল। কিছুদিন আগে জানা গেছে ওই ধুলো চাঁদের ধুলো।

সমাবেশ -সমাচার

কথামৃতকারের জন্মদিন পালন

আধুনিক গীতা রামকৃষ্ণ কথামৃতের রচয়িতা 'শ্রীম' বা মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের ১৬৪তম জন্মদিন এবং জন্মতিথি এক ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করল রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন। গত ১৪ জুলাই শুক্রবার এই উপলক্ষে উত্তর কলকাতায় কথামৃত ভবনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মঠ ও মিশনের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসীবৃন্দ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন স্বামী বলভদ্রানন্দ। উপস্থিত ছিলেন স্বামী বোধসরানন্দ, স্বামী বাগীশানন্দ, স্বামী গিরিশানন্দের মতো মিশনের পরিচালন পর্ষদের উচ্চ-পদাধিকারী সন্ন্যাসীরা। প্রত্যেক বক্তাই তাদের কথকতায় 'শ্রীমর' অসাধারণ অধ্যাত্মভাব নিষ্ঠা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা উল্লেখ করেন। বর্তমান মানব সভ্যতা চরম সমস্যা ও সঙ্কটের



সম্মুখীন হয়েছে নানাবিধ অনৈতিক কর্মকাণ্ডের দৌলতে, তা থেকে মুক্তির একমাত্র আলোকবর্তিকা এই রামকৃষ্ণ ভাব ও বাণীর যথার্থ অনুধাবন ও অনুধ্যান। তাই শ্রীম রচিত কথামৃতই আজকের ভারত তথা গোটা দুনিয়ার কাছে শান্তি, প্রেম ও সত্যের বারিধারা। এদিন কথামৃত ভবন সংলগ্ন একটি বাড়ি আনুষ্ঠানিকভাবে মঠ-মিশন অধিগ্রহণ করে। পরবর্তীতে এই অঞ্চলের যাবতীয় উন্নয়নমূলক সেবাকর্ম পরিচালিত হবে এই বাড়ি থেকে। একই সঙ্গে কথামৃতকারের একটি আবক্ষ মূর্তির উন্মোচন করা হয়।

সুতাহাটায় ড. শ্যামাপ্রসাদ জন্মজয়ন্তী

শ্যামাপ্রসাদ স্মৃতি রক্ষা কমিটির উদ্‌যোগে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়া মহকুমার সুতাহাটায় সুবর্ণ জয়ন্তী ভবনে গত ৬ জুলাই অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১১৭তম জন্মদিবস উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানে ৮০০ জন শ্যামাপ্রসাদ অনুরাগী নাগরিক অংশগ্রহণ করেন। অতিথি বরণ, দীপ প্রজ্বলন, ভারতমাতা ও ড. শ্যামাপ্রসাদের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। বর্তমান সামাজিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও শ্যামাপ্রসাদ শীর্ষক আলোচনায় অংশ নিয়ে প্রাক্তন সাংসদ লক্ষ্মণচন্দ্র শেঠ শ্যামাপ্রসাদের জীবন ও দেশসেবায় তাঁর অনন্য ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। এরপর শ্যামাপ্রসাদের স্মৃতিতে রচিত সঙ্গীত পরিবেশন করেন নিরঞ্জন প্রামাণিক। সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈত চরণ দত্ত বক্তব্য রাখেন। শেষে অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রাক্তন অধ্যাপক প্রভাস চন্দ্র সামন্ত শ্যামাপ্রসাদের আদর্শকে হৃদয়ে ধরে রেখে ভয়মুক্ত চিত্তে মানুষের হৃদয়কে জয় করার কথা বলেন।

এই সময়

নৃত্যে দেশ

সিরিয়ার নৃত্যশিল্পী আহমেদ জুডেহ্ সারা বিশ্বের কাছে দেশের প্রকৃত ভাবমূর্তি তুলে



ধরতে চান। সেই সঙ্গে মুছে ফেলতে চান ইসলামিক স্টেটের ভয়াবহ স্মৃতি। খবরটি পেয়ে তারই এক ভক্তের প্রতিক্রিয়া, 'খুব শক্ত কাজ। দেখুন চেষ্টা করে।'

১৩৭-এ প্রথম

দক্ষিণ ক্যারোলিনা নিবাসী এক দম্পতি কন্যাসন্তান লাভ করে রীতিমতো আপ্লুত।

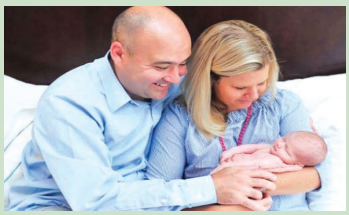

সদ্য বাবা হওয়া উইল সেটল জানিয়েছেন তাদের পরিবারে ১৩৭-বছরে কোনও মেয়ে জন্মায়নি। এই দম্পতির একটি পুত্রসন্তান আছে।

বেলাশেষে

মৃত স্বামী পাঁচ মাসের এক বাছুরের ছদ্মবেশে ফিরে এসেছে। এমনটাই বিশ্বাস কম্বোডিয়ার



৭৪ বছর বয়েসি কিম হ্যাঙের। শতাধিক মানুষের সাম্প্রতিক জমায়েতে তিনি বলেন, 'আমার স্বামী যে কাজ যেভাবে করতেন বাছুরটিও সেইভাবে করে।'

সমাবেশ -সমাচার

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের উদ্যোগে একুশটি 'অবিবাহিত' দম্পতির 'বিবাহ'

পাথর খাদানে কাজ করতে করতেই লখিরাম রুবির প্রেমে পড়েছিলেন। তারপর দু'জনে একসঙ্গে থাকতে শুরু করেন। প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে সন্তানের জন্ম দেন। সামাজিক রীতি অনুযায়ী বিয়ে তাদের হয়নি। এখনও 'অবিবাহিত' কিন্তু সন্তানের বাবা-মা, এরকম ১৭টি সাঁওতাল দম্পতির 'বিবাহের' আয়োজন করেছিল পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম। এই দম্পতিদের সঙ্গে আরও ৪ দম্পতি যারা সদ্যই একসঙ্গে থাকতে শুরু করেছেন তাদেরও বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আদর্শে অনুপ্রাণিত একটি সংগঠন। দীর্ঘদিন ধরে এরা সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সামাজিক সাংস্কৃতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছেন। সাঁওতাল সমাজে এই সংগঠনটির প্রভাবের প্রমাণ সাম্প্রতিক হনুমান জয়ন্তীর মিছিল-সহ বীরভূমের জনজাতি সমবায় সোসাইটির নির্বাচনে বিজেপি-সমর্থিত প্রার্থীদের জয়ে পাওয়া গেছে।



স্থানীয় পুরোহিত লক্ষ্মীরাম কিসকু গণবিবাহ পরিচালনা করেন। এলাকার প্রধান মাঝি-সহ বিশিষ্ট অতিথিবর্গ বিবাহ এবং সামাজিক শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বিবাহের শেষে শংসাপত্র প্রদান করা হয়।

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের সংগঠন সচিব সুশীল সোরেন বলেন, 'এটা দেখা গেছে দারিদ্র্যের কারণে কিছু কিছু সাঁওতাল ছেলেমেয়ে সামাজিক বিবাহ করতে পারে না। সামাজিক রীতিনীতি না মেনে তারা একসঙ্গে থাকতে শুরু করে। এমনকী শিশুর জন্মও দেয়। সমাজ এদের ভালোভাবে নেয় না। উৎসবে-অনুষ্ঠানে এদের ডাক পড়ে না। এটা যে শুধু সংশ্লিষ্ট দম্পতিদের কাছে কষ্টকর তাই নয়, সমাজের পক্ষেও ক্ষতিকর। তাই সাঁওতাল সমাজের গণ্যমান্য মানুষদের উপস্থিতিতে জনজাতি রীতি অনুযায়ী এই গণবিবাহ ও শুদ্ধিকরণ সম্পন্ন হয়েছে। সাঁওতাল পুরোহিতের নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিটি আচার পালিত হয়েছে।' বিবাহের পর পাঁচ হাজার অতিথি এক বিশাল গণভোজে মিলিত হন। কলকাতার ব্যবসায়ী সতব্রত গোয়েল সামগ্রিক ব্যয়ভার বহন করেন। তাঁর নিজের বৈবাহিক জীবনের পঞ্চাশ বছর পূর্তির আনন্দ তিনি সাঁওতালদের গণবিবাহের মাধ্যমে সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেন।

সোমানি টুডু এবং তার স্ত্রী বাহামণি কিসকু অনেকদিন ধরে একসঙ্গে আছেন। বাচ্চাও আছে। এদিন তাদের সন্তানেরা বাবা-মা'র বিয়ে দেখল। ঝাড়খণ্ড থেকে এসেছিলেন কেমন মার্ডি এবং মিনু টুডু। কেমন বলেন, 'আজ থেকে আমরা সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচব। সমাজ আর আমাদের ছেলেমেয়েদের নিন্দা করবে না।'

এই সময়

অযোধ্যা বিতর্ক

সুপ্রিম কোর্ট শীঘ্রই অযোধ্যার রামমন্দির বিতর্ক নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। সম্প্রতি প্রধান



বিচারপতি জে. এস. কেহর এবং বিচারপতি ডি. ওয়াই চন্দ্রচূড়কে নিয়ে গঠিত যৌথ বেঞ্চ একথা জানিয়েছে। উল্লেখ্য, বিজেপি নেতা সুব্রহ্মনিয়ম স্বামী মামলার দ্রুত শুনানির জন্য উচ্চ আদালতকে অনুরোধ করেছিলেন।

হিংসা নয়

গোরক্ষা নিয়ে রাজনীতি অবিলম্বে বন্ধ করার ডাক দিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। সেই সঙ্গে



গোরক্ষা করতে গিয়ে যারা হিংসার আশ্রয় নিচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করেছেন সঙ্ঘের প্রচারপ্রমুখ মনমোহন বৈদ্য।

উদ্বিগ্ন চীন

ডোকলাম মালভূমিতে ভারতীয় এবং চীনা সৈন্য মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝেই



হুমকি দিচ্ছে চীন। অথচ চীনের সরকারি সংবাদপত্র গ্লোবাল টাইমস লিখেছে, সামরিক প্রস্তুতি নিলেও দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্কে তার প্রভাব পড়বে না। যুদ্ধ হলে তাদেরই যে ক্ষতি তা হাড়ে হাড়ে বুঝছে চীন!

সমাবেশ -সমাচার

সিউড়ি স্টেট ব্যাঙ্কের অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক এবং সাঁওতালি ভাষার মান্য লেখক লক্ষ্মণ হাঁসদা বলেন, 'যেসব দম্পতি বিয়ে না করে অনেকদিন একসঙ্গে আছেন, সাঁওতালি নিয়ম মেনে তাদের বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। সাধারণ মানুষ এটাই চাইছিল। এখানে উদ্যোগটা নিয়েছিল কল্যাণ আশ্রম। বিবাহে প্রতিটি সাঁওতালি নিয়ম মানা হয়েছে। 'জগ মাঝি' (সাঁওতাল ছেলেমেয়েদের যিনি বিয়ে দেন) এবং 'নায়েক' (প্রধান পুরোহিত) উপস্থিত ছিলেন। এই ধরনের উদ্যোগ সমাজকে জীবন্ত রাখার জন্য দরকার।'

বিপর্যয় মোকাবিলায় আয়ুষ চিকিৎসার দ্বারা জনস্বাস্থ্য পরিচালনা বিষয়ক কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ শিবির

ভারত সরকারের উদ্যোগে ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যবস্থাপনায় ও পরিচালনায় গত ১২ থেকে ১৪ জুলাই তিনদিন ব্যাপী সল্টলেক অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রেনিং ইনস্টিটিউশনে বিপর্যয় মোকাবিলায় আয়ুষ চিকিৎসার মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য পরিচালনা বিষয়ক কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হলো। এই কর্মশালায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শতাধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। বক্তব্য রাখেন এটিআই-এর অধ্যাপক মহম্মদ আবদুল গণি, দিব্যেন্দু সরকার, কেরল আয়ুর্বেদ কলেজের অধ্যাপক ডাঃ অ্যাফিল. এম. অ্যালেক্স। সকলকে সঙ্গে নিয়ে সঙ্গীত সহযোগে যোগের এক আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি করেন শ্রীশ্রী রবিশঙ্কর আশ্রমের যোগ শিক্ষকদ্বয় অঙ্কুর আগরওয়াল ও সঞ্জীব চ্যাটার্জী। কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন অলক সাহা, অধ্যাপক ডাঃ গৌতম আশ। যোগগুরু ডাঃ তুষার শীলের পরিচালনায় যোগ প্রদর্শন করেন জয় ও স্নিগ্ধা। ডাঃ সৌরভ কোলে বিপর্যয় মোকাবিলায় অপারেশনের বিভিন্ন তথ্যচিত্র সহ তুলে ধরেন।

রেড়ির গাছ জলকে আর্সেনিক মুক্ত করতে পারে, ভারত সরকারের অনুমোদিত আয়ুষ ঔষধ ও দ্রব্য ব্যবহারের জন্য। আদি অরিষ্ট ঔষধের, মর্মচিকিৎসা-অগ্নিকর্ম চিকিৎসা, অঙ্কুশবেঠন চিকিৎসার প্রতি উপস্থিত ডাক্তারবাবুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন চন্দন পাত্র। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ সব্যসাচী চক্রবর্তী, ডাঃ রবীন আদক, ডাঃ হরেন্দ্রনাথ কর, ডাঃ ধনঞ্জয় সরকার, অলক ঘোষ, হিমাংশু বেরা।

সভার শেষে সকলকে শংসাপত্র প্রদান করেন আয়ুষ বিভাগের রাজ্য সচিব দেবাশিস বসু। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অধ্যাপক ইন্দিরা চক্রবর্তী।

জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সঙ্ঘের আলোচনা সভা

গত ৬ জুলাই ভারত কেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সঙ্ঘ দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুরে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। বিষয় : 'ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে ড. শ্যামাপ্রসাদের অবদান'। সংগঠনের সম্পাদক অধ্যাপক কৃষ্ণ সরকার স্বাগত বক্তব্য রাখেন। অধ্যাপক শিবহরি দত্ত সভাপতিত্ব করেন। অজিত বিশ্বাস তাঁর বক্তব্যে শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের বিষয় বর্ণনা প্রসঙ্গে কীভাবে শ্যামাপ্রসাদ বাঙালি হিন্দুকে রক্ষা করেছিলেন এবং তাঁর প্রতিদানে স্বার্থান্বেষী কংগ্রেস নেতৃত্ব কীভাবে তাঁকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল তার বিশদ বর্ণনা করেন। অধ্যাপিকা লিপি ঘোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে শ্যামাপ্রসাদের নতুন একটি দিক তুলে ধরলেন। বাংলাভাষার উৎকর্ষ ও নারীশিক্ষার প্রসারে শ্যামাপ্রসাদের অবদান উল্লেখ করে তিনি বলেন, শ্যামাপ্রসাদ ছাত্রদের সমান চোখে দেখতেন— মুসলমান ও হিন্দু ছাত্রদের তিনি কোনো তফাৎ করেননি। তিনি চেষ্টা করতেন কীভাবে দেশীয় সংস্কৃতি ও মুক্ত ভাবনার শিক্ষা গড়ে তোলা যায়। সভায় অধ্যাপক অনুপম বেরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

মোদী সরকারের গৃহীত সংস্কারগুলি কোনও মায়াজাল নয়

অতিথি কলম

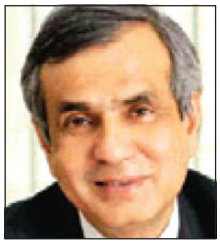

রাজীব কুমার

প্রসিদ্ধ 'The Economist' পত্রিকায় উদ্ধৃত পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে মোদীর পরিচালিত ভারত সরকার একধরনের 'অলীক সংস্কারের মোহে আচ্ছন্ন'। কথাটি যে আদৌ সত্যের কাছাকাছি যায় না তার প্রমাণ গত কয়েক বছরের ঘটনা পরম্পরা।

সম্প্রতি 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া'য় কেন্দ্রীয় সরকারের সহকারী অসামরিক বিমান পরিবহণ দপ্তরের মন্ত্রী জয়ন্ত সিনহা সরকারের নেওয়া ছ'ছটি বড় মাপের অভিমুখ বদলকারী সংস্কার প্রক্রিয়া গ্রহণ করার কথা বিশদে উল্লেখ করেছেন। আগামী দিনে এই সংস্কারগুলির সাফল্য ভারতীয় অর্থনীতির সামগ্রিক চেহারাটাই বদলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে (The big bang has Come, 30.6.17)।

এগুলি প্রত্যেকটিই অর্থনীতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটানোর সম্ভাবনাময়— (১) জিএসটি অর্থাৎ গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স, (২) ব্যাঙ্কবাপসি কোড (দেউলিয়া আইন), (৩) বেনামী, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত সংক্রান্ত আইন, (৪) অসাধু উপার্জনের কাঁড়ি কাঁড়ি টাকার জবাবদিহি (India Stack), (৫) দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আরবিআই-এর হাতে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার পূর্ণ স্বাধিকার প্রদান এবং (৬) রন্ধ্রে রন্ধ্রে গেড়ে বসা দুর্নীতিকে উপড়ে ফেলতে বিমুদ্রীকরণের মতো দুঃসাহসিক পদক্ষেপ।

একথা বলে দিতে হয় না যে এই ধরনের সংস্কারগুলি আদৌ লোক দেখানো হালকা চালের কোনো উদ্যোগ নয় যে শুধু অর্থনীতিকে একটু নেড়েচেড়ে দেখে যেমন ছিল তেমন রাখা। এগুলি বাস্তবে ধ্বংসাত্মক ও স্থিতাবস্থায় বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে সক্ষম। যে কথা প্রথমেই উল্লেখ করেছি যে প্রশাসনের গুণগত পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে সরকার দপ্তরগুলিতে বায়োমেট্রিক হাজিরা যন্ত্র বসিয়েছে। সরকারি খরচে উঠতে বসতে নেতা বা সরকারি অফিসারদের বিদেশ ভ্রমণের (প্রমোদ ভ্রমণ) সংস্কৃতি তুলে দেওয়া হয়েছে। মাসে দু'বার করে রাজ্যের রাজধানী শহরগুলিতে সরকার গঠিত 'প্রগতি কমিটির' সদস্যরা রাজ্যের সর্বোচ্চ আমলাদের সঙ্গে পরিকাঠামো সংক্রান্ত প্রকল্পগুলি কোনো বাধায় আটকে থাকলে সেগুলিকে খুলে দেওয়ার দ্রুত ব্যবস্থা নিচ্ছে। ইউরিয়া সারের ওপর নিম কোটিং (আস্তরণ) লাগিয়ে এই ক্ষেত্রে অপচয় সম্পূর্ণ বন্ধ করেছে। উপভোক্তার ব্যাঙ্ক খাতা (জনধন প্রকল্পে খোলা) গুলিতে সরাসরি তার প্রাপ্য সরকারি অনুদান বা অন্য খাতের টাকা জমা পড়ছে (টাকা মাঝ রাস্তায় গর্তে পড়ে যাওয়া বন্ধ)। মনরেগা প্রকল্পের কাজকে পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যেই চালিত করা হচ্ছে।

আপাতভাবে এই সব প্রকল্পগুলিকে হয়তো প্রান্তিক মনে হলেও এদের সম্মিলিত অভিঘাতের প্রভাবে প্রশাসনিক ক্ষেত্রের নিপুণতা অনেক বেড়েছে শুধু নয়, প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের দায়বদ্ধতা ও কাজের স্বচ্ছতাও বেড়েছে। আজকে এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োগে প্রশাসনিক ক্ষেত্রের আধিকারিক ও কর্মীদের এটা নজরে রাখতে হচ্ছে যে উন্নয়নের সুফল কেবল মাত্র অর্থবান, উচ্চমহলের সঙ্গে যুক্ত বা কেবল দুর্নীতিগ্রস্তরাই ভোগ করবেন তা যেন আদৌ না হয়। উল্টে এই উন্নয়ন সকলকে নিয়ে (inclusive) হচ্ছে কিনা সেটা নিশ্চিত করাই তাদের প্রধান কাজ।

প্রধানমন্ত্রীর আর একটি অন্যতম গুরুত্বের ক্ষেত্রে— সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রের কাজের সাফল্যের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান কমিয়ে আনা। অর্থাৎ আমরা যেমন

> "এই ধরনের সংস্কারগুলি আদৌ লোক দেখানো হালকা চালের কোনো উদ্যোগ নয় যে শুধু অর্থনীতিকে একটু নেড়েচেড়ে দেখে যেমন ছিল তেমন রাখা। এগুলি বাস্তবে ধ্বংসাত্মক ও স্থিতাবস্থায় বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে সক্ষম।"

অভিজ্ঞতায় জানি সরকারি বিষয় হলে কাজ পাওয়া যাবে না বা দেরি হবে। বেসরকারি ব্যাঙ্কে গেলে ঝট করে হয়ে যাবে। এই তফাত হটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। অন্যদিক থেকে বললে স্বাধীনতার পর এই প্রথম দিল্লিতে এমন একটি সরকার রয়েছে যারা দেশে 'জনহিতকর রাষ্ট্র ব্যবস্থা' চালু রাখতে তৎপর। এটা নিশ্চিত, আজকের ভারতে একটা সজাগ, ধারাবাহিক এবং সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট লক্ষাভিমুখী প্রচেষ্টা এই কারণেই নেওয়া হচ্ছে যাতে দেশের মানুষের প্রাপ্য পরিষেবাগুলি তারা নিশ্চিতভাবে পায়। আর এগুলি বাধ্যতামূলক পর্যায়ে নিয়ে যেতে আমলাস্তরে দায়বদ্ধতাকে কঠিনভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। সরকারি খরচের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য সঙ্কোচন হয়েছে। বহু হাজার কোটি টাকার বেনামি ভরতুকি চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। ভারতের ক্ষেত্রে প্রশাসনে উন্নতি সাধন ঘটানোই একটি বড়সড় কাঠামোগত সংস্কার বলে ধরতে হবে। এই প্রক্রিয়া সফল করতে মোদী তাঁর গুজরাটের হাতে কলমে তৃণমূল স্তরে কাজ করার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছেন। তিনি উপলব্ধি করেছেন যে কোনও উদারীকরণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে গেলে প্রথমেই প্রয়োজন উন্নয়নমুখী রাষ্ট্র।

এখানে উন্নয়নমুখী রাষ্ট্র বলতে তাকেই বোঝানো হচ্ছে যে রাষ্ট্র তার নাগরিকদের জন্য বুনিয়াদী সুযোগ সুবিধেগুলি প্রদানের বিশেষ করে সমাজের দরিদ্রতম অংশের অবস্থার পরিবর্তনে প্রয়োজনীয় উপকরণগুলির সরবরাহ সুনিশ্চিত করে। এই সূত্রে এযাবৎ চালু থাকা নাগরিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বেসরকারি মাধ্যমে সমাধান খোঁজার চেষ্টাকেও বন্ধ করা হচ্ছে। প্রাথমিক জনপরিষেবাগুলির ক্ষেত্রে বেসরকারি আউট সোর্সিং করার প্রবণতা ১৯৯১ সাল থেকে চালু হওয়ায় এক ধরনের বিশেষ শ্রেণীবিন্যাসভিত্তিক উন্নয়ন হয়েছে। চিরাচরিত সরকারি বিদ্যালয়গুলি, জনস্বাস্থ্য, গণপরিবহণ, বিদ্যুৎ সংবহন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে ভয়ঙ্কর নিম্নগামিতা দেখা দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বদল আনার চেষ্টায় বদ্ধপরিকর মোদী। তিনি এই ক্ষেত্রগুলির প্রশাসনিক স্তরে অত্যন্ত দৃঢ় পদক্ষেপ নিচ্ছেন যাতে গরিবের নাগালে উল্লেখিত জনপরিষেবাগুলি পৌঁছয়। একই সঙ্গে এই বুনিয়াদি সুবিধাগুলি সকলের জন্য উপলব্ধ হলে দেশে 'ব্যবসা করার স্বাচ্ছন্দ্যও' অনেক বাড়বে। অবশ্য এই বুনিয়াদী ক্ষেত্রগুলিতে পরিবর্তন আনার প্রক্রিয়াটি হবে অবৈষম্যমূলক, স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধতাযুক্ত। এ কাজ মোটেই সোজা নয়। কায়েমি স্বার্থ প্রতিটি স্তরে বাসা বেঁধে রয়েছে। তারা পদে পদে বাধা দেবে। এই নিচের স্তরে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল টেকনোলজি প্রয়োগের ওপর জোর দিয়েছেন। নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যনির্ভর এবং ধারাবাহিক নজরদারির মাধ্যমেই এই পরিবর্তন আনা সম্ভব। একই সঙ্গে প্রতিনিয়ত তৃণমূল স্তরের ফিডব্যাকও নিতে হবে।

এই অত্যন্ত কঠিন কিন্তু নিতান্ত প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক কাঠামোগত সংস্কারের ক্ষেত্রে সাফল্যের মুখ দেখতে পেলেই ভারতের উন্নয়নের গতিমুখে যে বাতাস লাগবে তা অপ্রতিরোধ্য। জিডিপি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গুণগতভাবে এই পরিবর্তন সামাজিক ক্ষেত্রে প্রভূত উপকার সাধন করবে। করপোরেট হাউসগুলি বহু অন্যায্য, অপ্রাপ্য সুবিধে ভোগ করে থাকে যেগুলি থেকে ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়িক উদ্যোগগুলি সর্বদাই বঞ্চিত থেকে যায় সেগুলিও ঘুচবে। এর সাফল্যে দেশে বিনিয়োগও পর্যাপ্ত বৃদ্ধি পাবে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সদাজাগ্রত মোদী নজর রেখেছেন। তিনি এমন কোনো কিছুতে হাত লাগাবেন না যাতে তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা একজোট হয়ে যেতে পারে। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ক্রমাগত উন্নয়নের পাশাপাশি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুস্থিতি বজায় রাখতে তিনি সদা তৎপর। এই দ্বিমুখী কর্মকৌশলের ফলে বিরোধীরা আজ দেখছে তারা স্ব স্ব রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অজান্তেই কতটা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছেন। মোদীর প্রকল্পে তারা আগামী নির্বাচনে পরিত্যক্ত হয়ে পড়তে পারেন। এই প্রচেষ্টায় মোদীকে হারানো দুষ্কর।

মোদীর ভারত আজ উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের প্রান্তসীমায়। আজকের তারিখের বিভিন্ন জনমত সমীক্ষায় ও দেশের শেয়ার বাজারের উত্তুঙ্গী চলাচলে বোঝা যাচ্ছে ভারতের মানুষ এই পরিবর্তনের সঙ্গী হতে উন্মুখ। তাই বলা দরকার, এটি উন্নয়নের কোনও আলেয়া নয়। মাটিতে গেড়ে বসা এক দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ উন্নয়নমুখী সংস্কার প্রক্রিয়া। বস্তুত এতে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই।

(লেখক পহলে ইন্ডিয়ান ফাউন্ডেশনের ডাইরেক্টর)

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫, হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name : United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

বসিরহাট দাঙ্গা

কাকতালীয় কিনা জানি না, ঘটনার কয়েকদিন আগে আমার এক পরিচিত যে বসিরহাটে থাকে, সে আমাকে বলেছিল যে বসিরহাটে প্রচুর মুসলমান জমায়েত হয়েছে। একই ঘটনা কালিয়াচকেও হয়েছিল।

ঘটনার সূত্রপাত সৌভিক সরকার নামে এক হিন্দু ছেলের করা ফেসবুক পোস্ট থেকে। পোস্টটা নবি আর কাবা শরিফ নিয়ে ছিল। পোস্ট করার পরের দিন থেকেই এলাকায় মুসলমানরা পাকিস্তানের পতাকা কাঁধে নিয়ে মিছিল করে। মুখে স্লোগান দেয়, যে পোস্ট করেছে তার শাস্তি চাই। এই মিছিলে বাচ্চা বুড়ো সকলেই ছিল। সংখ্যা ছিল কয়েক হাজার। এত কম সময়ে এক দিনের নোটিশে এত লোক কী করে আসতে পারে যদি জিনিসটা আগে থেকেই প্ল্যান না হয়ে থাকে?

পুলিশ যথারীতি সৌভিককে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু মুসলমানেরা ওকে পাথর মেরে হত্যা করতে বলে শরিয়া আইন অনুযায়ী। পুলিশ তা করে না। এরপর দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। রাজ্যপাল ঘটনাটা মুখ্যমন্ত্রীর কানে তুললেন। আধাসেনা নামাতে বললেন। মুখ্যমন্ত্রী খানিক হাতপা ছুঁড়ে নাটক করলেন। কমব্যাট ফোর্সকে থানায় বসিয়ে রাখলেন। অতঃপর রাজ্যপাল ঘটনাটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহকে জানালেন। রাজনাথজী কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠালেন। এইখান থেকে লোকাল মিডিয়া এবিপি আনন্দ পথে নামল ড্যামেজ কন্ট্রোল করতে। এবিপি আনন্দ গোড়া থেকেই দেখাতে লাগলো বসিরহাটে হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতি আছে। আর বিজেপি ধর্মের রাজনীতি করে হিংসা ছড়াচ্ছে। এতে বিষয়টা আরো জোলো হয়ে গেল। বসিরহাটে তৃণমূল কাউকে ঢুকতে দিল না। বোঝাই যাচ্ছে উদ্দেশ্য— সম্প্রীতির যে মরিচিকা এবিপি আনন্দ দেখাচ্ছে সেটা যাতে নষ্ট না হয়।

পাকিস্তানের পতাকা নিয়ে মিছিল করাটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। পাকিস্তানের পতাকা নিয়ে মিছিল কেন? সন্ত্রাসবাদীদের যুক্ত থাকার এর চেয়ে বড় প্রমাণ কিছু আছে? কিছুদিন আগে থেকেই শুনছিলাম ফেসবুকে যে বাদুড়িয়া ও বসিরহাটের জায়গায় জায়গায় পাকিস্তানের পতাকা লটকে দেওয়া হয়েছে। বিশ্বাস করিনি। কিন্তু পাকিস্তানের পতাকা হাতে মিছিলের ভিডিও দেখে আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। বিশ্বাস করতেই হলো। এই ভিডিও জাল হতে পারে না কারণ ওদের স্লোগান শোনা যাচ্ছে। ভাষা বাংলা। ওরা ভারত সরকারের কাছে প্রশ্ন করছে অর্থাৎ ওরা ভারতে আছে। কোথায় বাংলা ভাষা চলে ভারতে? শুধু পশ্চিমবঙ্গে। এই উপমহাদেশে একটা দলই আছে যারা পাকিস্তানপন্থী। তারা হলো জামাতে ইসলামি বাংলাদেশ। তাহলে কি এরা এই দাঙ্গার পিছনে যুক্ত আছে? হয়তো।

দ্বিতীয়ত, পুলিশের ওপরে হানা। কিন্তু কেন? একটা ধর্মনিরপেক্ষ শাসনযন্ত্রের অঙ্গের উপর কেন হানা? আর পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হলো ভিতর থেকে। এটিও আশ্চর্য ঘটনা। পুলিশ মার খাচ্ছে আর তার হাত পা বেঁধে রেখেছে সরকার। কিন্তু কেন? জনমানসে কি মুখ্যমন্ত্রী এই বার্তা দিতে চান যে মুসলমানরা এতটাই শক্তিশালী যে পুলিশও ওদের হাতে মার খায়, সুতরাং মুসলমানের বিরুদ্ধে পুলিশে গিয়ে লাভ নেই? পাঠক সিদ্ধান্ত করুন।

তৃতীয়ত, সরকারের যে রেসপন্স হলো তাতে ওরা দেখল যে রাজ্যপালও ওদের কোনো ক্ষতি করতে পারেন না। এই রাজ্যের সরকার ওদের সঙ্গে আছেন।

চতুর্থত এবং সবশেষে হামলার প্যাটার্ন বা শৈলী দেখে অনেক কিছু মনে পড়ে যায়। প্রথমে মুসলমানদের জমায়েত করা এবং তারপর ফেসবুক পোস্ট থেকে হামলা শুরু আর হামলাকারীদের সরকারি অফিস বিশেষ করে পুলিশে উপর আক্রমণ। দেগঙ্গা, ক্যানিং, ধুলাগড়, কালিয়াচক সর্বত্র একই শৈলী। কালিয়াচকে দাঙ্গা ছড়িয়েছিল কমলেশ ত্রিপাঠির ফেসবুক পোস্ট থেকে। এ থেকে বোঝা যায় যে যেহেতু শৈলী এক সেহেতু একটাই দল হামলাগুলো পর পর করেছে। হয় তারা বহু ভাগে বিভক্ত হয়ে করেছে, নয়তো একই দল ঘুরে ঘুরে দাঙ্গা করে যাচ্ছে। দলটা জামাতে ইসলামি বাংলাদেশ, তা তাদের পাকিস্তানি পতাকা থেকে প্রমাণিত।

লোকাল মিডিয়ার ভূমিকা হচ্ছে সবথেকে নিরাশাজনক। এইখানে এই শর্মার একটা পরামর্শ আছে। আপনি একটি লোকাল মিডিয়া আর একটি ন্যাশনাল মিডিয়া ফলো করুন। সত্য জানতে পারবেন।

এরপর এইরকম ছুঁতোয় নাতায় মিছিল করে প্রদর্শন এবং দাঙ্গা ভবিষ্যতে কলকাতায় হতে চলেছে বলে আশঙ্কা হয়। কাশ্মীরের সঙ্গে এই বঙ্গের বহু মিল পাওয়া যায়। কাশ্মীরে ল্যান্ড বর্ডার পাকিস্তান আর চীনের সঙ্গে। এই বঙ্গে ল্যান্ড বর্ডার বাংলাদেশ আর চীনের সঙ্গে। দুই রাজ্যই মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং দুই রাজ্যই দাঙ্গাপ্রবণ। সুতরাং কাশ্মীর মডেলে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা ভারত সরকারের আশু প্রয়োজন। নয়তো পশ্চিমবাংলা বাংলাদেশ হতে বেশি দেরী নেই।

—**অর্ণব কুমার ব্যানার্জী,** কলকাতা।



ভারতের নাথ সম্প্রদায়

গত ১৫ মে ২০১৭ স্বস্তিকায় নির্মলেন্দু চক্রবর্তীর 'ভারতের নাথ সম্প্রদায়' শীর্ষক নিবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ২৬ জুন ২০১৭ ধীরেন দেবনাথের আলোচনা প্রসঙ্গে আমি কিছু আলোকপাত করতে চাই। নিবন্ধের প্রথমেই নির্মলেন্দু চক্রবর্তী মহাশয় লিখেছেন— 'নাথ সম্প্রদায় মূলত বাংলা তথা পূর্ব ভারতের, এটি উদ্ভব হয়েছে বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখা থেকে'। এই বিষয়ে ধীরেন দেবনাথের আলোকপাতের সঙ্গে আমি সহমত পোষণ করছি। নিবন্ধকার শ্রী চক্রবর্তী ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের অনুমানভিত্তিক --- 'গোরোক্ষনাথ দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্তমান ছিলেন। তাঁর গুরু মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ হয়তো আরও ৫০/৬০ বছর পূর্ববর্তী হবেন'। লেখক মাননীয় শ্রী চ্যাটার্জীর অনুমান ভিত্তিক ঐতিহাসিক নির্ভরতার সপক্ষে কোনো প্রামাণিক যুক্তি না দেখিয়ে নিবন্ধের একটা সংশয় রেখে দিলেন। এই প্রসঙ্গে বলে

রাখি--- 'মৎস্যেন্দ্রনাথ ছিলেন নাথ সম্প্রদায়ের একজন আচার্য। হঠযোগপ্রদীপিকা গ্রন্থের একটা শ্লোকে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়— 'হঠবিদ্যাং হি মৎস্যেন্দ্র গোরক্ষাদ্যা বিজানতে।/স্বাত্মারামহথবা যোগী জানীতে তৎপ্রসাদদতঃ'। এই মৎস্যেন্দ্রনাথ বিষয়ক একটা কিংবদন্তি প্রচলিত। কিন্তু কোনও কল্পগাথার সূত্র ধরে মৎস্যেন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক সময়কাল নির্ধারণ করা কষ্টকল্পিত নয় কি? ধীরেন দেবনাথ মহাশয় কোন তথ্য অনুসারে বললেন— 'মৎস্যেন্দ্রনাথ নেপালে শৈবধর্ম প্রচার করতে গিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন বৌদ্ধদের ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি অনেকটার সমর্থক'। 'ভারতের নাথ সম্প্রদায়' নিবন্ধের লেখক নির্মলেন্দু চক্রবর্তীর বৌদ্ধদের মহাযান সম্প্রদায় থেকে নাথ সম্প্রদায় গড়ে উঠার তত্ত্বে মান্যতা কতটা যৌক্তিকতা দাবি করে? এই 'নাথসম্প্রদায়' বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা করেছেন 'তপোভূমি নর্মদার' লেখক শ্রী শৈলেন্দ্র নারায়ণ ঘোষালশাস্ত্রী। বিগত শতাব্দীর পাঁচের দশকে নর্মদা পরিক্রমাকালে বহু সাধু-সন্তের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। তাঁদের বৈচিত্র্যময় জীবন গাথা উক্ত বইয়ের পাতায় পাতায় রেখে গেছেন। নর্মদা পরিক্রমার একেবারে প্রথম দিকে লেখক নাথ সম্প্রদায়ের যোগী যোগনাথজীর সহিত পরিচিতি লাভ করেন। লেখক কৌতূহল মনে জিজ্ঞাসা করিলেন--- 'গোরক্ষনাথজীর সম্প্রদায়ে হঠযোগ কি মুখ্য সাধন? না অন্য কোনো নিগূঢ় সাধন পদ্ধতি আছে। তিনি বললেন--- গুরু গোরক্ষনাথজী শ্রেষ্ঠ যোগীপুরুষ ছিলেন। নাথপন্থে হঠযোগ, রাজযোগ, লয়যোগ, মন্ত্রযোগ প্রভৃতি সাধনমার্গ আছে।

কথা প্রসঙ্গে যোগনাথজী বললেন— নাথপন্থে না এলে সাধনরাজ্যের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। কলিযুগে স্বয়ং শিবই গোরক্ষনাথজী রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। গোরক্ষনাথজী নেপালের জাতীয় দেবতা। তাঁর নাম অনুসারেই নেপালের অধিবাসীদের গোর্খা নাম হয়েছে। নেপালের তৎকালীন মহারাজা ত্রিভুবন নারায়ণ সিংহের প্রপিতামহ গোরক্ষনাথজীর আশীর্বাদই নেপালের স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তাঁর আশীর্বাদ আছে— 'যাবচন্দ্র দিবাকরৌ' নেপালের স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত থাকবে। চিতোরের রাণা বংশের প্রতিষ্ঠাতা বীর হাম্বীরকে গোরক্ষনাথজীই এক দিব্য খড়্গ দান করেন। সেই দিব্যবলে বলীয়ান হয়ে তিনি সমগ্র মেবার জয় করেছিলেন। জ্বালামুখী তীর্থ গোরক্ষনাথজীর তপস্যা স্থল। কলকাতার কালীঘাটের কালীমূর্তি এবং নকুলেশ্বর ভৈরবের প্রতিষ্ঠা গোরক্ষনাথজী করেছিলেন। ওই কালী ও শিবের নিত্যপূজার ভার দিয়েছিলেন চৌরঙ্গীনাথকে। তখন কলকাতা জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। জঙ্গলের মধ্যে চৌরঙ্গীনাথজী যে জায়গায় বসতেন সেই স্থানের নাম বর্তমান চৌরঙ্গি। গোরক্ষনাথজী কে তা জেনে রাখা দরকার— গোরক্ষনাথজী নিজে শৈবদেহ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর প্রবর্তিত সাধনায় প্রবেশ করলে, তাঁর স্পর্শ পেলে যে-কোনো সাধকের দেহ চিন্ময় হয়ে যায়। (তথ্যসূত্র— তপোভূমি নর্মদা— শ্রী শৈলেন্দ্র নারায়ণ ঘোষালশাস্ত্রী, পৃ. ৬১-৬২, ৭১-৭২)

অতএব এ থেকে নির্মলেন্দু চক্রবর্তীর 'ভারতের নাথ সম্প্রদায়' নিবন্ধে বৌদ্ধদের মহাযান শাখা থেকে উদ্ভবের সপক্ষে কতটা প্রমাণ পাওয়া যায়? বঙ্গে তুর্কী আক্রমণের কালে বৌদ্ধ ও নাথধর্মীদের একাংশ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল এবং উভয় সম্প্রদায়ের অবশিষ্টরা আত্মরক্ষার্থে পেশাগত পরিবর্তনের মাধ্যমে অবশিষ্ট হিন্দুদের মধ্যে নিজেদের মিশিয়ে দিয়েছিলেন। এর সপক্ষে বহু প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন গবেষণালব্ধ পুস্তকে।

—বিরূপেশ দাস,
বিজয় তোরণ, বর্ধমান।

চীনের হুমকি

১৯৬২ সালে চীনের ভারত আক্রমণের পর চীন ভারতের কাছে হয়ে যায় শত্রুদেশ। পণ্ডিত নেহরুর 'হিন্দি চীনি ভাই ভাই' স্লোগানের ঘটে পরিসমাপ্তি। আকসাই চীন-সহ অরুণাচল প্রদেশের এক বিশাল অঞ্চল চলে যায় চীনের দখলে। বিশ্বাসঘাতক চীন এরপরেও ভারতের ক্ষতিসাধনে ক্ষান্তি দেয়নি। বরং ভারতের সর্বনাশ সাধনে হয়েছে আরও বেশি সচেষ্ট। ভারতের চিরশত্রু ইসলামিক সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের কারখানা পাকিস্তানের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে সে। ভারতের বিরুদ্ধে সে পাক জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ এবং ভারতের অভ্যন্তরে অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতাকে করছে সমর্থন। উদ্দেশ্য, ভারতের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে ভারতকে দুর্বল করা। পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে সীমান্তে যে ছায়াযুদ্ধ চালাচ্ছে, ভারতের অভ্যন্তরে জঙ্গি অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে এবং কাশ্মীরীদের ভারত বিরোধী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী করে তুলছে— তাতেও মদত জোগাচ্ছে চীন। তাছাড়া পাকিস্তান যাতে আন্তর্জাতিক মঞ্চে সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষিত না হয় তার পিছনেও কলকাঠি নাড়ছে সে। এমনকী, পাক জঙ্গি সংগঠন 'জয়েশ-ই-মহম্মদ'-এর পাণ্ডা মাসুদ আজহারকে চীন ভেটো দিয়ে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। ইতিপূর্বে চীন ভারতের এন এস জি-র সদস্য পদপ্রাপ্তিরও করেছে বিরোধিতা। তাই চীনের শত্রুতা আজ সুবিদিত।

দলাই লামা এর আগেও বহুবার অরুণাচল প্রদেশ সফর করেছেন। গিয়েছেন চীনের ভাষায় 'বিতর্কিত' এবং তিব্বতের অংশ বলে দাবি করা তাওয়াংয়েও। তখন কিন্তু এবারের ন্যায় এত কড়া ভাষায় সফরের বিরোধিতা করে চীন হুমকি ও হুঙ্কার ছাড়েনি। এর কারণ অবশ্য বিবিধ। যথা— (১) ভারতের ১ লক্ষ কোটি টাকার বুলেট ট্রেনের বরাত হাতছাড়া হওয়া— যা পেয়েছে চীনের শত্রু জাপান, (২) চীন ও পাকিস্তানের মধ্যে গড়ে ওঠা কয়েক হাজার কোটি ডলারের অর্থনৈতিক করিডর বালুচিস্তান, বালটিস্থান, গিলগিটের বিদ্রোহীদের বিক্ষোভে বাধাপ্রাপ্ত, যার পিছনে ভারতের মদত আছে বলে উদ্বিগ্ন চীনের ধারণ, (৩) অরুণাচল প্রদেশের ভালুকপং-তাওয়াং রেলপথ নির্মাণ বাস্তবায়নে ভারতের উদ্যোগ, (৪) ভারতের বিশাল অস্ত্রসজ্জা ও সফল ক্ষেপনাস্ত্র উৎক্ষেপণ, (৫) চীনের আর্থিক সমৃদ্ধির হার হ্রাস, (৬) ইস্পাত আমদানিতে চীনের উপর ভারতের নির্ভরতা কামানো ইত্যাদি। তবে চীনের কড়া হুমকি-হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও দলাই লামার অরুণাচল প্রদেশ সফর যে নির্বিঘ্নে ঘটেছে সেটাই চীনকে ভারতের সমুচিত জবাব।

—ধীরেন দেবনাথ, কল্যাণী, নদীয়া।

আমাদের ধর্ম, আমাদের কর্ম
সংযমের অন্য নাম একাদশী

পরম্পরা

নন্দলাল ভট্টাচার্য

শয়ন উত্থান পাশ মোড়া
তার মধ্যে ভীমে ছোঁড়া।
দুই ছেলের জন্মতিথি
অষ্টমী নবমী দুটি।
খ্যাপার চোদ্দ খেপীর আট
এই নিয়ে কাল কাট।
তাও যদি না কত্তে পারিস
ভগার খালে ডুবে মরিস।



এটি একটি গ্রাম্য ছড়া। লোকায়ত এই ছড়ার মধ্য দিয়ে বলা হয়েছে সারা বছরের করণীয় উপবাস এবং অনুষ্ঠানের কথা। বছরে থাকে মোট চব্বিশটি একাদশী। একাদশীর দিন উপবাস এবং সংযম পালন শাস্ত্রের নির্দেশ। কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রীয় বিধি কোনও সময়ই তত কঠোর নয়। তাই সকলেরই ওই চব্বিশ দিন উপোস করার বাধ্যবাধকতা নেই। বছরে অন্তত চারটি একাদশী করলেই পালন করা হবে শাস্ত্রের নির্দেশ।

এখানে প্রশ্ন, কেন একাদশী পালন করা দরকার? তার সঙ্গে অবধারিত ভাবেই দ্বিতীয় প্রশ্ন, কম করে চারটি একাদশীই বা কেন? এবং সেটা কি যে-কোনও চারটি একাদশী?

তারই উত্তর রয়েছে ওই গ্রাম্য ছড়ায়। কেন একাদশী সেই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগে একবার বরং ওই ছড়ার মর্মটি বোঝা যাক। ওই ছড়ার চারটি একাদশী হলো আষাঢ়, ভাদ্র, কার্তিক এবং মাঘ মাসের শুক্লা একাদশী। এই চারটি একাদশীর বিশেষ নাম যথাক্রমে শয়ন, পার্শ্ব, উত্থান এবং ভীম একাদশী। এই চার একাদশীর অন্য নাম পদ্মা, বামনা, প্রবোধিনী এবং জয়া।

এখানে একটি কথা বলা দরকার। হিন্দুর সব পূজা-পার্বণ-অনুষ্ঠান হয় চান্দ্র মাস অনুযায়ী। চান্দ্র বছরের মোট দিনসংখ্যা ৩৬০। প্রতি মাসে ত্রিশ দিন এবং ১৫ দিন করে দুটি পক্ষ। সেই হিসেবে কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষ মিলিয়ে বছরে একাদশীর সংখ্যা মোট চব্বিশটি। তার মধ্যে কম করে মাত্র চারটি দিন উপবাসের বিধি।

বছরে ওই চারটি একাদশী, দুই ছেলের জন্মতিথি যাতে কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী এবং রামের জন্মতিথি রামনবমী, খ্যাপার চোদ্দ অর্থাৎ শিব চতুর্দশী বা শিবরাত্রি এবং খেপীর আট-এর অর্থ দুর্গা পুজোর মহাষ্টমী। ৩৬০ দিনের মধ্যে সব মিলিয়ে অন্তত এই আটদিন উপবাস ও অনুষ্ঠান করার নির্দেশ। এটাকে কি খুব কঠোর নির্দেশ বলা যাবে?

এবার আসা যাক একাদশীর কথায়। একাদশীর অন্য নাম হরিবাসর। এই দিনটি বিশেষ করে উচ্চবর্ণের বিধবাদের, ব্রাহ্মণদের এবং অন্য ব্রতধারীদের পক্ষে পালনীয়। উপোস কিন্তু বাধ্যতামূলক নয়। নিরম্বু উপবাস তো নয়ই। যিনি পারবেন তিনি পুরো উপোস করতেই পারেন। সেটা নির্ভর করছে ব্যক্তির শারীরিক সামর্থ্য এবং ইচ্ছার ওপরে। না-পারলে ফলমূল, এমনকী রাতে হবিষ্যান্নও চলতে পারে। বিকল্পে হবিষ্যান্নের পরিবর্তে একবেলা রুটি-লুচি-পরোটাও।

এক সময় যে বিধবাদের নিরম্বু উপবাসে প্রায় বাধ্য করা হোত সেটা কোনও শাস্ত্রীয় বিশেষ বিধি অনুযায়ী নয়। একেবারেই লোকাচার। তার পিছনে অবশ্য পারিবারিক স্বার্থচেতনাও কাজ করত অনেক সময়।

একাদশীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে হরি বা বিষ্ণুর আরাধনার বিষয়টি।

আষাঢ়ের শুক্লা একাদশীতে বিষ্ণু নিদ্রাভিভূত হন। তাই ওই একাদশীর নাম শয়ন একাদশী। ভাদ্র মাসের শুক্লা একাদশীতে তিনি পাশ ফেরেন বলে সেটি পার্শ্ব একাদশী আর কার্তিকের শুক্লা একাদশী হয় বিষ্ণুর নিদ্রা ভঙ্গের দিন। এই কারণে এর নাম উত্থান একাদশী। আর মাঘ মাসের শুক্লা একাদশীটি মধ্যম পাণ্ডব

ভীম পালন করেছিলেন বলে সেটি তাঁরই নামে ভীম বা ভৈমী একাদশী নামে পরিচিত।

পরের প্রশ্ন, কেন এই একাদশী? বিভিন্ন পুরাণ মতে একাদশী পালন করলে পার্থিব নানা আশা পূরণ হয়। আর লাভ হয় পরমার্থ— বিষ্ণুর বা হরির কৃপা। একাদশীর মাহাত্ম্য নিয়ে আছে নানা পৌরাণিক কাহিনি। একাদশী পালন করে মান্ধাতা হয়েছিলেন সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর। মাঘ মাসের শুক্লা একাদশী পালন করে ভীম মুক্ত হন পিতৃঋণ থেকে।

একাদশীর উপবাসের মাহাত্ম্যকথা আছে বৃহন্নারদীয় পুরাণের ভদ্রশীল, নারদ পুরাণের রুক্মাঙ্গদ, জৈমিনীর ভারতের চন্দ্রহাসের কাহিনিতে। এই প্রসঙ্গেই ভাগবতে রাজা অম্বরীশের একাদশী পালন নিয়ে উগ্রতপা ঋষি দুর্বাসার চূড়ান্ত নাকাল হওয়ার কথা তো অনেকেরই জানা।

বিষ্ণুভক্ত রাজা অম্বরীশ একবার বছরব্যাপী একাদশী ব্রত পালন করেন। তিনদিন উপবাসী থেকে দ্বাদশীতে পালন করবেন এমন সময় এসে হাজির ঋষি দুর্বাসা। আতিথ্য নিয়ে দুর্বাসা কালিন্দীতে যান স্নান এবং নিত্যকৃত্য পালন করতে। যে-কোনও কারণেই হোক, দুর্বাসার আসতে অত্যন্ত দেরি হয়। এদিকে পারনের সময় যায় যায়। অম্বরীশ দুকুল রক্ষা করার জন্য পুরোহিতদের পরামর্শে এক গণ্ডুষ জল পান করে পারণ করছেন, এমন সময় দুর্বাসা ফিরে আসেন। তাঁকে ভোজন না করিয়েই রাজা জলপান করছেন দেখে ক্ষিপ্ত দুর্বাসা মাথার জটা ছিঁড়ে মাটিতে ফেলেন। তৈরি হয় কৃত্যা। রাজাকে হত্যা করার জন্য ছুটে আসে সে। সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুর সুদর্শন কৃত্যাকে ভস্ম করে ছুটে যায় দুর্বাসার দিকে। প্রাণভয়ে দুর্বাসা ছোটেন। পেছনে ধেয়ে আসে সুদর্শন। দুর্বাসা একে একে ইন্দ্র, ব্রহ্মা, শিবের কাছে চান আশ্রয়। কিন্তু আশ্রয় দেন না কেউ। দুর্বাসা এবার শরণ নেন বিষ্ণুর। বিষ্ণু বলেন, দুর্বাসা অন্যায় করেছেন তাঁর ভক্ত অম্বরীশের কাছে। তাই রাজা যদি ক্ষমা করেন তবেই রেহাই পাবেন দুর্বাসা। বাধ্য হয়ে অম্বরীশের কাছেই যান দুর্বাসা। রাজাও সুদর্শনকে নিরস্ত করেন। তারপর দুর্বাসাকে আহার করিয়ে নিজে ভোজন করে সম্পূর্ণ করেন পারণ। এ হেন একাদশী পালন শুধু পরমার্থের জন্য নয়, শারীরিক সুস্থতার জন্যও। আর সেটাই নির্দেশ শাস্ত্রের।

চাতুর্মাস্য :

হরির এই শয়নকালের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আরও একটি ব্রত অনুষ্ঠান। নাম যার চাতুর্মাস্য। আষাঢ়ের শুক্লা একাদশী থেকে কার্তিকের শুক্লা একাদশী— এই চারমাস ধরে পালন করা হয় এই ব্রত। এখন মূলত সন্ন্যাসীরাই এই ব্রত পালন করেন। এই চারমাসে ছেদ পড়ে তাঁদের পরিব্রাজক জীবনের। এই সময় একই জায়গায় থেকে তাঁরা সেটি পালন করেন।

শুধু সন্ন্যাসী নয়, গৃহস্থরাও পালন করেন এই ব্রত। এই ব্রতকালে ওই সময়ের রুচিকর ফলমূল খাওয়া নিষিদ্ধ। সবরকম ভোগ্যবস্তু ত্যাগ করে অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ হয়ে পালন করতে হয় এই ব্রত। ব্রতকালে শ্রাবণ মাসে শাক, ভাদ্রে দই, আশ্বিনে দুধ এবং কার্তিকে আমিষ খাওয়া বারণ। পটোল, বেগুন এবং কলমি শাকও নিষিদ্ধ। এই সময়ে অনেকে তালও খান না।

ব্রত মাহাত্ম্যে বলা হয়েছে, এই সময় গুড় ত্যাগ করলে সুকণ্ঠের অধিকারী হওয়া যায়। একই ভাবে তেল বর্জনে সুদেহ, মধুমাংস না খেলে আধিব্যাধি থেকে মুক্তি, একদিন অন্তর উপবাস করলে বিষ্ণুলোক লাভ হয়। এই ব্রতও মূলত সংযমী জীবনযাপনের জন্য। ত্যাগ ও কৃচ্ছ্র সাধনের মধ্য দিয়ে সুন্দর জীবন গঠন এবং পরিণামে ঈশ্বরপদ লাভের লক্ষ্যেই এই ব্রত।

গরুড় পুরাণে আছে, 'এক রাত্রোপথাসাচ্চ দেবো বৈশানিকো ভবেৎ'— একরাত্রিও উপবাস করলে ব্রতী দেবত্ব অর্জন করেন। সংযমী জীবনযাপনের মধ্য দিয়েই মানুষ দেবতায় পরিণত হতে পারে,— এটাই চাতুর্মাস্যের মূল শিক্ষা। অবশ্য শুধু চাতুর্মাস্য নয়, হিন্দুর সব অনুষ্ঠানই মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার সাধনা। ■

সংযমের তিথি একাদশী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ হিন্দু অধ্যাত্ম দর্শনের সিদ্ধান্ত আত্মা অবিনশ্বর। আত্মাকে ছেদন করা যায় না, দগ্ধ করা যায় না। দেহ জীর্ণ হলে আত্মা তাকে ত্যাগ করে অন্য দেহ ধারণ করে। হিন্দুশাস্ত্র সদ্য পিতৃহীন বা মাতৃহীন ব্যক্তিকে একবছর একাদশী পালনের নির্দেশ দেয়। এর উদ্দেশ্য অন্তরের কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করা। বাবা-মা অনেক কষ্ট করে সন্তানকে বড়ো করে তুলেছেন। মাসের দুটি পক্ষে দুটি একাদশীতে সংযম পালনের মাধ্যমে সন্তান সেই কষ্টস্বীকারকে স্মরণ করবেন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন এবং শেষে বাবা কিংবা মার আত্মার মুক্তির জন্য বিশ্ব-নিয়ন্তার কাছে প্রার্থনা করবেন। এটাই শাস্ত্রের নির্দেশ। হিন্দু দর্শন অনুযায়ী কোনো এক দুর্জ্ঞেয় চরম শক্তি সমগ্র বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করেন। শ্রীবিষ্ণু তাঁর প্রতিভূ। তাই লোকান্তরিত আত্মা যাতে বিষ্ণুশরণ প্রাপ্ত হন তার জন্য প্রার্থনা করা হিন্দুদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। এই প্রার্থনার একটা মাধ্যম একাদশীতে সংযম পালন। যে-কোনো বয়েস বা লিঙ্গের মানুষ একাদশী পালন করতে পারেন। ব্রতধারী অশক্ত বা অসুস্থ না হলেই হলো। সংযম অর্থে একাদশীর দিন উপবাস করা, বাজে চিন্তা না করা এবং বাজে কথা না বলা বোঝায়। অনেক সময় দেখা যায় সধবাদের তুলনায় বিধবারা বেশি সংখ্যায় একাদশী পালন করেন। এটা কিন্তু লোকাচার। এ ব্যাপারে শাস্ত্রের কোনো নির্দেশ নেই। এমনকী উপবাসের সময় জল খাওয়া চলবে কিনা তাই নিয়ে শাস্ত্র জোর করে কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয় না।

মহাভারতে নারী সুদেষ্ণা

দেবপ্রসাদ মজুমদার

মহাভারতের অপ্রধান নারী চরিত্রের জন্য সুদেষ্ণা অনন্য ও ভাস্বর। উত্তরার জননী বিরাট রাজমহিষী ছিলেন এই সুদেষ্ণা। মহাভারতকার বিরাট পর্বে এই নারীচরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। সুদেষ্ণা ছিলেন কেকয়রাজের কন্যা, সেইজন্য তাঁকে কৈকেয়ীও বলা হোত। রামায়ণে দশরথের মধ্যম পত্নীও কেকয়রাজ কন্যা কৈকেয়ী। কেকয়রাজ্য নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে, বিয়াস ও শতদ্রু নদীর মাঝখানে কোনো এক স্থানে এই রাজ্য ছিল। বেদে, শতপথ ব্রাহ্মণে, উপনিষদে, রামায়ণে ও পুরাণে কেকয় রাজ্যের উল্লেখ আছে। রামায়ণের কালে গান্ধার রাজ্যের পূর্বসীমা থেকে বিপাশা পর্যন্ত এই রাজ্য বিস্তৃত ছিল। রামায়ণে ওই রাজ্যের রাজধানী গিরিব্রজ বা রাজগৃহ বলে উল্লিখিত আছে। অনেকে বলেন ঝিলাম নদীর তীরবর্তী জালালপুর, প্রাচীন নাম গির্জাক, তাই গিরিব্রজ। অজ্ঞাতবাসকালে পঞ্চপাণ্ডব যখন দ্রৌপদীকে নিয়ে ছদ্মবেশে প্রবেশ করলেন এবং দ্রৌপদী সৈরন্ধ্রীবেশে বিরাট রাজপুরীতে প্রবেশ করছেন, তখনই রাজমহিষী সুদেষ্ণা তাঁকে দেখতে পেয়ে নিজের কাছে ডাকিয়ে আনলেন। এর পূর্বে সুদেষ্ণার কোনো পরিচয় মহাভারতকার উপস্থাপিত করেননি। সৈরন্ধ্রীরূপী দ্রৌপদীর কাছ থেকে সুদেষ্ণা জানতে পারলেন যে সৈরন্ধ্রী একজন সামান্য কর্মপ্রার্থিনী পরিচারিকা, তথাপি সৈরন্ধ্রীর অসামান্য রূপ লাবণ্য লক্ষ্য করে সুদেষ্ণা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না, এক পরিচারিকার এমন রূপ লাবণ্য হতে পারে।



ব্যক্তিগতভাবে বিরাট মহিষী সুদেষ্ণা নিজ স্বামীর চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করতেন। তাই তিনি সৈরন্ধ্রীর মতো রূপ যৌবন সম্পন্না সুন্দরীকে রাজ অন্তঃপুরে স্থান দেওয়া ঠিক হবে কিনা তাই ভাবতে লাগলেন। আর এ বিষয়ে তিনি তাঁর সন্দেহ গোপন করেননি। তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন— 'রাজা যদি তোমার রূপে মুগ্ধ না হতেন, তবে তোমাকে মাথায় করে রাখতাম।' কিন্তু রাজা তোমাতে অবশ্যই আসক্ত হবেন। আমার অন্তঃপুরের নারীরা পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। কোনো পুরুষ কি তোমাকে দেখে স্থির থাকবে? আর রাজা বিরাট তোমার দিব্য রূপ দেখতে পেলে আমাকে ত্যাগ করে তোমাতেই আসক্ত হবে।'

এরপর সৈরন্ধ্রী রূপীনী দ্রৌপদী যখন বললেন যে তিনি তাঁর গন্ধর্ব পতিগণের দ্বারা সুরক্ষিতা, ওই কথা বিশ্বাস করে মহারানী সুদেষ্ণা তাঁকে অন্তপুরে স্থান দিয়েছিলেন। প্রায় এক বছর অতিক্রান্ত হতে চলল, সৈরন্ধ্রী রূপীণী দ্রৌপদী বিরাট রাজ অন্তপুরেই রইলেন। এদিকে সুদেষ্ণার ভাই রাজার শ্যালক ও বিরাট রাজের সেনাপতি কীচক সৈরন্ধ্রীকে দেখে আর স্থির থাকতে পারলেন না, নানান ভাবনা চিন্তা করে কীচক সৈরন্ধ্রীকে পাবার জন্য সুদেষ্ণার শরণাপন্ন হলো। ইতিপূর্বে কীচক সৈরন্ধ্রীকে প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে অপমানিত ও তিরস্কৃত হয়েছিলেন। এখন যে-কোনো উপায়ে সৈরন্ধ্রীকে পাবার জন্য সে সুদেষ্ণার কাছে ধরে বসল, ওই সময় স্বামীর চরিত্রের প্রতি সন্দিগ্ধা সুদেষ্ণাও চাইছিলেন যেমন করেই হোক ওই সুন্দরী সৈরন্ধ্রীকে কীচকের কাছে পৌঁছে দিলে তিনি অন্তত রক্ষা পাবেন। কিছুদিন থেকেই সৈরন্ধ্রী সুদেষ্ণার উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু সুযোগ উপস্থিত হলো যখন কীচক মহিষী সুদেষ্ণাকে অনুরোধ করল যে যে-কোনো উপায়েই হোক তিনি যেন সৈরন্ধ্রীকে তাঁর কাছে পাঠান। সুদেষ্ণা কীচকে বললেন যে বিশেষ কোনো পর্বদিন উপস্থিত হলে তিনি যেন সুরা ও অন্নাদি প্রস্তুত রাখেন এবং সুরা আনবার ছলে সৈরন্ধ্রীকে তিনি পাঠালে একাকী সৈরন্ধ্রীকে নির্জনে রাজি করালেই তাঁর বাসনা পূর্ণ হতে পারে। যাইহোক, পরিকল্পনা মতো নির্দিষ্ট দিনে সুদেষ্ণা সৈরন্ধ্রীকে একাকী কীচকের ভবনে যেতে বাধ্য করলেন। যথারীতি কীচক সৈরন্ধ্রীকে আকর্ষণ ও অপমানিত করলেন। সৈরন্ধ্রী রাজসভায় উপস্থিত হয়েও কোনো প্রতিকার পেলেন না। কাঁদতে কাঁদতে তিনি সুদেষ্ণার ভবনে ফিরে এলেন। সৈরন্ধ্রীকে কাঁদতে দেখে সুদেষ্ণা অজ্ঞতার ভান করে বললেন,— 'ভদ্রে, তুমি কিসের জন্য কাঁদছ? কে তোমায় দুঃখ দিয়েছে? এরপর সৈরন্ধ্রীর মুখে কীচকের অত্যাচার ও বিরাট রাজের উদাসীনতার কথা শুনে সুদেষ্ণা বলেছেন— 'হে সুকেশি, তুমি যদি বল, তবে আমি দুর্বৃত্ত কীচককে বধ করাইব।' এতে সুদেষ্ণা চরিত্রের কুটিলতা প্রকাশিত। এছাড়া বিরাট পর্বেই আমরা পাই দ্রৌপদী ভীমের কাছে তাঁর নিজের দুঃখ লাঞ্ছনার কাহিনি বর্ণনা করে বলছেন— 'তুমি যখন সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করছিলে, তখন অন্তপুরের নারীগণ খুব কৌতুক বোধ করছিল। আর তোমার লাঞ্ছনায় আমার চিত্ত দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। আমাকে অত্যন্ত দুঃখিত লক্ষ্য করে কৈকেয়ী (সুদেষ্ণা) পুরনারীগণকে বললেন— 'সৈরন্ধ্রী রূপবতী, বল্লব (ছদ্মবেশী ভীমসেন) ও সুপুরুষ। স্ত্রীলোকের মনোভাব বোঝা খুব কঠিন। এই সৈরন্ধ্রী ও বল্লভ পরস্পরের যোগ্য।' এই কথা বলে সুদেষ্ণা সর্বদাই আমাকে শাসন করেন ও তোমাতে অনুরক্তা বলে আশঙ্কা করেন।

উপরোক্ত কথা দ্বারা সুদেষ্ণা চরিত্র যে কতটা সন্দেহপ্রবণ ও কুটিল তার পরিচয় পাওয়া যায়। মহাভারতকারের মহারানী সুদেষ্ণার এমন অভিনব মনোভাব সম্পন্ন স্ত্রী চরিত্র সৃষ্টি সত্যই অভিনব। এখনো মনুষ্য সমাজে বহু চরিত্র ওইরূপ দেখা যায়। ■

অবিবাহিত এবং বিবাহবিচ্ছিন্ন মেয়েদের দত্তক গ্রহণ এখন আরও সহজ

অঙ্গনা

অনন্যা চক্রবর্তী

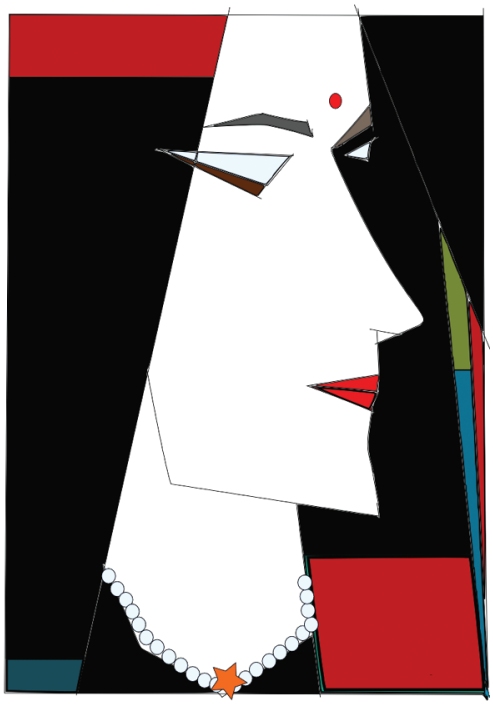

অবিবাহিত মহিলাদের বাচ্চা দত্তক নেওয়ার প্রক্রিয়াটি আগে বেশ জটিল ছিল। ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে ড. মালা শর্মা (নাম পরিবর্তিত) বাচ্চা দত্তক নেবেন বলে সেন্ট্রাল অ্যাডপশন রিসোর্স এজেন্সিতে নিজের নাম নথিভুক্ত করেন। তার আগে তিনি মিশনারিজ অব চ্যারিটি-সহ একাধিক বেসরকারি সংস্থায় চেষ্টা করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে মালার অভিযোগ, 'প্রথমেই ওরা প্রশ্ন করেন আমি কেন বিয়ে করিনি। বাচ্চাকে ঠিকমতো মানুষ করতে পারব কিনা...দীর্ঘদিন ধরে প্রশ্নোত্তর পর্ব চলতে থাকে কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয় না।' অথচ সেন্ট্রাল অ্যাডপশন রিসোর্স এজেন্সি, সি এ আর এ (কারা)-তে নাম নথিভুক্ত করার দু' বছরের মধ্যেই (ডিসেম্বর, ২০১৫) মালার ডাক পড়ে। প্রতি ডাকে তিনটে করে বাচ্চা দেখানোর নিয়ম ছিল সেই সময়। এখন যদিও একটি করে বাচ্চা দেখানো হয়। যাই হোক, ডাক সহজে মিললেও কাজের পদ্ধতি এখানেও জটিল এবং অনাবশ্যক প্রশ্নোত্তরে দীর্ঘসূত্রী। মালা বলেন, 'যতবার ওরা ডাকেন প্রত্যেকবার একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। একবার আমি বাবা-মা ও ভাইকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমারও যে একটা পরিবার আছে এবং আমিও যে একটা বাচ্চার দায়িত্ব নিতে পারি এটা বোঝানোই ছিল আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু ওরা বললেন, আমার বাবা-মার বয়েস হয়েছে, তাই ওদেরও দেখাশোনার প্রয়োজন। আমি ভবিষ্যতে বিয়ে করব কিনা তাও জানতে চাইলেন। সব শেষে মালা অভিযোগ করলেন, 'আসলে ওরা চান না কোনও অবিবাহিত মহিলা বাচ্চা দত্তক নিক। তাই এভাবে নিরুৎসাহ করেন।'

এই প্রেক্ষাপটে সি এ আর এ (কারা) বাচ্চা দত্তক নেবার প্রক্রিয়া আরও সহজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই উদ্দেশ্যে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছে অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বনির্ভর চল্লিশোর্ধ কোনও অবিবাহিত বা বিবাহবিচ্ছিন্ন মহিলা যদি বাচ্চা দত্তক নিতে চান তাহলে তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। কারার সি ই ও দীপক কুমার বলেন, 'গত কয়েক বছরে দত্তক গ্রহণে ইচ্ছুক অবিবাহিত মহিলাদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। তাই দত্তকগ্রহণের প্রক্রিয়াকে আরও সহজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রক। স্বয়ং মানেকা গান্ধী এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছেন।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত বছর কেন্দ্রীয় সরকার সারোগেসি রেগুলেশন বিল, ২০১৬ সংসদে পেশ করেছে। বিলটি যদি উভয়কক্ষে অনুমোদিত হয় তাহলে গর্ভ ভাড়া দিয়ে সন্তান বিক্রির ব্যবসা ভারতে আইনত নিষিদ্ধ হবে। সরকার কড়া হাতে এই অসাধু প্রবণতা নির্মূল করতে চায়। তার জন্য অবিবাহিত এবং বিবাহবিচ্ছিন্ন মহিলা বা নিঃসন্তান দম্পতিরা যাতে দত্তক গ্রহণ ভিন্ন অন্য কোনও উপায়ে সন্তানলাভ না করতে পারেন সেটা নিশ্চিত করা সরকারের কর্তব্য।

আরও একটা কারণে দত্তক গ্রহণের প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছ করা দরকার। একটি সমীক্ষা থেকে জানা গেছে দেশে দত্তক গ্রহণের সংখ্যা ক্রমশ কমছে। ২০১২-১৩ সালে ৪৬৯৪ টি শিশুকে দত্তক নেওয়া হয়েছিল। ২০১৬-১৭-তে এখনও পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে ৩২১০ জনকে। আরও একটি অসঙ্গতি মন্ত্রকের গোচরে এসেছে। ০-২ বছর বয়েসি বাচ্চাদের তীব্র চাহিদা। ফলে একটু বেশি বয়েসি বাচ্চারা উপেক্ষিত হচ্ছে। এ ব্যাপারে সরকার গণসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য নানারকম চিন্তাভাবনা করছে। ■



অমর্ত্য সেন ভাবের ঘরে চুরি

কুণাল চট্টোপাধ্যায়

আবার অধ্যাপক অমর্ত্য সেন সংবাদ শিরোনামে। তাঁকে নিয়ে নির্মিত একটি চলচ্চিত্রে (দি আর্গুমেনটেটিভ ইন্ডিয়ান) ব্যবহৃত চারটি শব্দে চলচ্চিত্র সেনসর বোর্ড নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। অমর্ত্য সেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন এক বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব। ১৯৯৮-তে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হওয়ার পর শিক্ষিত ভারতীয় নাগরিকের কাছে তিনি সমধিক পরিচিত। মনে আছে ১৪ অক্টোবর তাঁর নোবেল প্রাপ্তির সংবাদ যখন দূরদর্শনে ঘোষিত হয় পরদিন দিল্লির প্রায় সবকটি ইংরেজি দৈনিকেই তাঁকে নিয়ে সম্পাদকীয় লেখা হয়, কিন্তু কলকাতার কোনো ইংরেজি দৈনিকে ১৫ অক্টোবর তাঁর সাফল্যকে নিয়ে কোনো সম্পাদকীয় লেখা হয়নি।

নোবেল প্রাপ্তির পর অধ্যাপক সেনের বাণিজ্যায়ন (Commercialisation of Prof. Sen) বেশ চোখে পড়ার মতো ছিল। পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন সরকার নানা অনুষ্ঠানে সেনের বিপণনে প্রায় নিরঙ্কুশ অধিকার কায়েম করেছিলেন। সেইসব অনুষ্ঠানে আমজনতার অন্যতম প্রাপ্তি ছিল আমাদের মাস্টারমশাই অসীমদার (অসীম দাশগুপ্ত) প্রাককথনে অধ্যাপক সেনের কল্যাণকর অর্থনীতি, বিশেষ করে সামাজিক পছন্দ, দারিদ্র্যের পরিমাপ প্রভৃতি জটিল দুর্বোধ্য বিষয়গুলির সহজ সরল ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা।

কী গভীরতা, কী বিষয় বৈচিত্র্য, প্রতিভার এই দুই নিরিখেই তিনি অসাধারণ। On capital theory-তে তাঁর বুদ্ধ-সুভূতির কথোপকথন, কৃষ্ণ থেকে কান্ট্, কিংবা অযোধ্যার বিতর্কিত সৌধ সঙ্কট সর্বত্রই তিনি কলম ধরেছেন। যেটা আমাদের অবাক করে তা হলো শান্তিনিকেতনে যাঁর সৃষ্টি, প্রেসিডেন্সীতে পুষ্টি ও কেমব্রিজে শ্রীবৃদ্ধি সেই প্রবাদ প্রতিম বাঙালিটি বাংলা লেখার প্রতি বেমানান কার্পণ্য দেখিয়েছেন। এপর্যন্ত বাঙালি তাঁর কোনো মৌলিক বাংলা লেখা পায়নি। 'জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি' বইটি অনুবাদ করা। Collective Choice-এর প্রবক্তার বাংলায় কলম না ধরাটাও বোধহয় একটা Choice।

অতি সম্প্রতি এদেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে কলকতায় তিনি বলেছেন, সংখ্যালঘুদের প্রতি অবিচারকে এখানকার গণতন্ত্র ক্ষমা করেনি। তত্ত্ব ও যুক্তি দিয়ে নিজের মতো করে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁর বক্তব্যকে। কিন্তু আমাদের প্রত্যাশা ছিল আরো একটু বেশি।

অধ্যাপক সেনের ভাবনা চিন্তায় এক ধরনের বামপন্থী প্রভাব ছিল বলে ভাবা হয়। মরিস ডবের কাছে অর্থনীতির দীক্ষা ও তাঁর Choice of Techniqul এর মতো অসামান্য গবেষণা। এমনকী পরবর্তীকালে দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের কাজগুলো তার প্রমাণ। ভারতে নেহরু- মহলানবিশ মডেল ও পরিকল্পনার মাধ্যমে সার্বিক বিকাশের পক্ষে তাঁর অবস্থানকে জগদীশ ভগবতী, সুব্রহ্মণ্যম স্বামীর মতো অর্থবেত্তারা সমালোচনা করেন।

মনে করা যেতেই পারে আজকের বাস্তবে দাঁড়িয়েও অধ্যাপক সেন নিজেকে পাল্টাননি। নন্দীগ্রাম অধ্যায়ে তাঁর বামফ্রন্টকে পরোক্ষ সমর্থন ও নোট বাতিল বিরোধিতায় তা স্পষ্ট। তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন তাঁর ভোট নরেন্দ্র মোদী পাবেন না। সেই সঙ্গে সচেতন ভাবেই বলেননি মনমোহন সিং তাঁর ভোট পাবেন কিনা।

অধ্যাপক সেন সম্পর্কে অকাল প্রয়াত অধ্যাপক কল্যাণ সান্যাল একদা বলেছিলেন বিব্রত করতে পারে এমন প্রশ্নকে মনোহারিণী বাক্য জালের আড়ালে এড়িয়ে যাওয়ার ঈর্ষণীয় ক্ষমতার অধিকারী তিনি। তাঁর সর্ব শেষ স্বদেশ সফরে বিশ্বজোড়া জ্বলন্ত জনসংখ্যা বিন্যাস তথা demographic reality-র বিষয়টি অধরা থেকে গেছে। এই বাংলায় অনুপ্রবেশজনিত জনসংখ্যায় ধর্মীয় ভারসাম্যের মতো জরুরি ও ভয়াবহ সমস্যাটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে অতীতে রাজ্যপাল সি রাজেশ্বর বামফ্রন্টের রোষানলে পড়েছিলেন। একই ভাবে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীও বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর বিরাগভাজন হয়েছেন। এ বিষয়টি অধ্যাপক সেনকে কখনো ভাবায়নি। একই ভাবে ভারতীয় গণতন্ত্রের স্বরূপ উন্মোচনে মুখর হলেও চীনের কারাগারে বন্দী নোবেল জয়ী লিউ শিয়াবোর মর্মান্তিক মৃত্যুর প্রতিবাদে অধ্যাপক সেনকে বিশ্বের গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষজনের সঙ্গে গলা মেলাতেও দেখা যায়নি। শিয়াবো ৩৫০ জন চীন বুদ্ধিজীবীর স্বাক্ষর-সহ চার্টার ৮ নামে বহু দলীয় গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

বর্তমানে শতাংশের বিচারে জম্মু-কাশ্মীরের পর পশ্চিমবঙ্গেই মুসলমান সংখ্যা সর্বাধিক। একদিকে সমতল বঙ্গে জনবিন্যাস-জনিত সঙ্কট, অন্যদিকে দার্জিলিং পাহাড়ে জাতিসত্ত্বাজনিত জটিলতা। এর বাইরে খেলা, মেলা, পুজো, উৎসব, খুঁটি পুজো ও রবীন্দ্রনাথে মেতে আছে বাঙালি। অমর্ত্যবাবু সেই বাঙালির একজন নন। কোনো দীর্ঘমেয়াদি শিল্প, পৌর, স্বাস্থ্য, শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনা চোখে পড়ছে না। আগের মুখ্যমন্ত্রীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীও প্রতি বছর শিল্প আনতে বিদেশ যাচ্ছেন।

সত্তরের দশকে জরুরী অবস্থার শেষে রাজনীতি প্রিয় বাঙালির হাতে হাতে দুটি বই ঘুরতো। একটি বরুণ সেনগুপ্তের লেখা ইন্দিরা একাদশী। অন্যটি রণজিত রায়ের Agonies of Bengal-এর বাংলা অনুবাদ—ধ্বংসের পথে পশ্চিমবঙ্গ। তারপর নিরঙ্কুশ বাম ও কংগ্রেস (তৃণমূল) শাসনে পশ্চিমবঙ্গ কোথায় আজ দাঁড়িয়ে এবং কী তার ভবিষ্যৎ সেটা যদি অধ্যাপক অমর্ত্য কুমার সেন তাঁর পরবর্তী ভারত সফরে জানান তাহলে বাঙালি মাত্রই বৌদ্ধিক ভাবে ঋদ্ধ হবে।

(লেখক এইচ আই টি-র অধ্যাপক)

বিজেপিকে চাপে ফেলতে গিয়ে নিজেরাই বিপাকে

গুজরাটে হাঁড়ির হাল কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গুজরাটের জল ঘুলিয়ে তাতে মাছ ধরতে গিয়ে এবার বড়সড় ধাক্কা খেল কংগ্রেস। এমনিতে সারাদেশেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ক্রস ভোটিংয়ের ধাক্কায় দেখা গিয়েছে মীরা কুমারের বিবেকের আহ্বানে সাড়া দিতে পারেননি তাঁর সমর্থনকারী শিবিরের লোকজনই। তবে পশ্চিমবঙ্গ বাদে গুজরাটে এই ক্রস ভোটিংয়ের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত। কংগ্রেসের

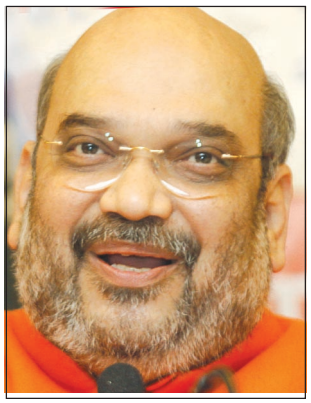

অমিত শাহ



আলিঙ্গনরত শঙ্কর সিং বাঘেলা ও নরেন্দ্র মোদী।

প্রথম থেকেই লক্ষ্য ছিল গুজরাটে অশান্তি সৃষ্টি করা, যাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চাপে রাখা যায়। কংগ্রেসের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে বিজেপি বিধায়ক নলিন কোটাডিয়া মীরা কুমারকে তাঁর ভোটদানের কথা আগে-ভাগে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে জানিয়ে দেন।

কংগ্রেসের পদলেহনকারী কিছু মিডিয়া ও কংগ্রেস নেতৃত্ব আনন্দে লাফাতে লাফাতে ঘোষণা করে দেয় এই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনই বিজেপির শেষের শুরু। হার্দিক প্যাটেল এমন বিদ্রোহ করেছে যে ২০১৮-র বিধানসভা নির্বাচনে গুজরাটে কংগ্রেসকে রোখ কে! আর তারপরে ২০১৯-এ রাহুল গান্ধীর প্রধানমন্ত্রী হওয়াই বা কে আটকায়! কিন্তু আপাতত কংগ্রেসের এই দিবাস্বপ্ন ঘোরতর দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। বিজেপির একের জবাবে কংগ্রেসের এগারোজন বিদ্রোহ করেছেন এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তাঁদের ভোট বিজেপি প্রার্থী রামনাথ কোবিন্দের ব্যালট বাক্সেই জমা হয়েছে।

আপাতত নরেন্দ্র মোদীর চেয়ার ছেড়ে রাজ্যসভার আসনটিকে কোনওক্রমে বাঁচাতে চাইছে কংগ্রেস। তাদের অবস্থা এখন ভিক্ষে চাই না কত্তা, কুকুর সামলান। ১৮২ সদস্যের গুজরাট বিধানসভায় বিজেপির সদস্য ১২২ জন, কংগ্রেসের ৫৭ জন, দুজন শরদপাওয়ারের ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি ও একজন সংযুক্ত জনতা দলের। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জনতাদলের বিধায়ক ভোট দেননি। অর্থাৎ মোট ১৮১ জন বিধায়কের মধ্যে রামনাথ পেয়েছেন ১৩২টি এবং মীরা কুমার ৪৯টি। এন সি পি-র ভোটদাতারা তাঁদের দলীয় নীতি মেনে মীরাকেই ভোট দিয়েছেন। বিজেপির একজন বিদ্রোহীর বাদ দিলে রামনাথের পাওয়ার কথা ছিল ১২১ জনের ভোট। কিন্তু তিনি পেয়েছেন ১৩২ জনের ভোট। বলাই বাহুল্য এই অতিরিক্ত ১১ জনই কংগ্রেসের বিধায়ক। মীরার বিবেকের আহ্বানে যাঁরা কর্ণপাত করেনি।

আর এখানেই সিঁদুরে মেঘ দেখছে কংগ্রেস। তাদের এই রক্তক্ষরণের মাঝে গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো বিরোধী দলনেতা শঙ্কর সিং বাগেলা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরের দিনই অর্থাৎ ২১ জুলাই পরিস্থিতি বেগতিক দেখে কংগ্রেস নেতৃত্বকে দুষে দলত্যাগ করেছেন। তাঁর অন্তত দশ-বারোজন অনুগামী বিধায়কও দল ছাড়ছেন। এই মুহূর্তে গুজরাট থেকে কংগ্রেসের রাজ্যসভার সদস্য সোনিয়া গান্ধীর রাজনৈতিক সচিব আহমেদ প্যাটেল। এই পদের মেয়াদ শেষ হয়েছে। নির্বাচন কমিশন এই রাজ্যে ৮ আগস্ট রাজ্যসভা ভোটের দিন ধার্য করেছে। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৮ জুলাই। আহমেদ প্যাটেলকে পুনর্নির্বাচিত করতে দরকার ৪৬ জন বিধায়কের ভোট। কিন্তু সব মিলিয়ে যা পরিস্থিতি তাতে এই সংখ্যাটিও জোগাড় করতে হিমসিম খেতে হচ্ছে কংগ্রেসকে।

তাই মোদীর চেয়ারের চেয়ে আপাতত আহমেদ প্যাটেলের আসন বাঁচাতেই তাঁরা বেশি ব্যগ্র। ■

আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে গলব্লাডারের চিকিৎসা

ডাঃ শৈলেশ কুমার



নিউদিল্লিস্থিত ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া হাসপাতালে একজন রোগী পিত্তথলিতে জমে থাকা পাথর অপারেশন করার জন্য সকালে ভর্তি হয়েছিল। বিকালে অপারেশন করে বাড়ি চলে গেল। দু'-তিন দিন পর নিজের কাজও করতে শুরু করল। এটা এই জন্যই সম্ভব হয়েছে কারণ তার অপারেশন নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে হয়েছে। পূর্বে এই অপারেশনের জন্য রোগীকে কয়েকদিন হাসপাতালে ভর্তি থাকতে হোত। এরপরেও প্রায় একমাস বিশ্রাম নিতে হোত। বর্তমানে গলবাল্ডারের অপারেশন দূরবীন বা লঘু দূরবীনের সাহায্যে হচ্ছে। পূর্বে এই অপারেশেনের জন্য বেশ খানিকটা পেট কাটতে হোত। ফলে রোগীর পেটে ৮/১০ ইঞ্চি লম্বা দাগ স্থায়ীভাবে থেকে যেত। বর্তমানে দূরবীনের সাহায্যে অপারেশনের ফলে দাগ হলেও খুবই হালকা যা প্রায় দেখা যায় না। অপারেশনের পর রোগীর ব্যথা বেদনা খুবই কম অনুভব হয়। ব্যথা এত কম যে কারো কারো ব্যথার বড়ি খাওয়ারও দরকার হয় না। অপারেশনের ৪-৬ ঘণ্টা পরেই রোগীর ছুটি হয়ে যায়। এতে হাসপাতালের খরচ কম হয়। রোগীরও খরচ বাঁচে। হাসপাতালে থাকার হয়রানি কম হয়। হাসপাতালে কে থাকতে চায়? হাসপাতালে মানুষ বাধ্য হয়ে আসে। হাসপাতাল থেকে ছুটি পেলে রোগীর মনে আনন্দ হয়, এতে রোগের উপশম সহজে হয়। নতুন প্রযুক্তির এটাই সবচেয়ে বড় লাভ।

চিকিৎসা : পিত্তথলিতে পাথর জমলে কিছুদিন ঔষধ দিয়ে চাপা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু অপারেশনই শেষ কথা। পিত্ত ও লিভারের যত চিকিৎসা তাতে পাথরের অপারেশনই বেশি। এটাও বলা যায়, সারা বিশ্বে যত অপারেশন হয়, তার মধ্যে গলব্লাডারের অপারেশন বেশি। পিত্তথলির চিকিৎসা প্রথম শুরু করেন ১৪২০-তে ইটালির Pathologist Antourio Banifisis। পরবর্তী ২০০ বছর গলব্লাডারের চিকিৎসা ওষুধের দ্বারাই হচ্ছিল। ১৬৩০-এ জাম্বেকার ও ১৬৬৭-এ তেচাফ (ইটালি) জানোয়ারকে এই ওষুধ প্রয়োগ করে প্রমাণ করলেন যে পিত্তথলি না থাকলেও জীবনে বেঁচে থাকা যাবে। ১৬৮৭-তে Boder Beal পেট কেটে অপারেশন করে দেখালেন পিত্তথলিতে পাথর জমে। ১৭৩৩-এ জিন পেটিট প্রথম পাথর অপারেশন করেন। তিনি থলি কেটে পাথর বের করে আবার থলির মুখ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এটাকে আমরা cholosystostomy বলে জানি। এই পদ্ধতি বেশ কয়েক বছর চলছিল। কিন্তু এই অপারেশনের পরেও রোগীর কষ্ট স্থায়ীভাবে লাঘব হোত না। ১৮৮২-তে প্রথমবার জার্মানির ডাঃ Laugebach open cholosystostomy করলেন। সম্পূর্ণ থলি কেটে বাদ দিয়ে দিলেন। এই প্রক্রিয়া তিনি মৃত মনুষ্য দেহ নিয়ে প্রয়োগ করেছিলেন। এই প্রক্রিয়া অনেক মানুষের মধ্যে সফল হতে লাগল এবং ওই সার্জেনের নাম ছড়িয়ে পড়ল। ধীরে ধীরে অপারেশনের এই প্রক্রিয়া সবদেশে চলতে লাগল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে অপারেশনে দূরবীনের ব্যবহার শুরু হলো। শুরুতে এর প্রয়োগ কেবল স্ত্রীরোগের মধ্যেই সীমিত ছিল। পরে প্রায় সব অপারেশনে এর ব্যবহার শুরু হয়েছে। ১৯৮৫-তে জার্মানির Dr. Mede Ritch প্রথমবার দূরবীনের সাহায্যে পিত্তথলি কেটে বাদ দিয়েছিলেন। এই প্রক্রিয়া আজ সারা বিশ্বে চালু আছে। বর্তমানে এই প্রক্রিয়া প্রামাণিকতা লাভ করেছে। এই প্রক্রিয়াতে শুরুতে পেটে দুটি করে চারটি রাস্তা তৈরি করা হোত (১০ ও ৫ মিমি)। আজও কিছু চিকিৎসক এই পদ্ধতিতে অপারেশন করে থাকেন। কিন্তু কিছু পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে অনেক নিরাময় কেন্দ্রে চারটির পরিবর্তে তিনটি রাস্তা— ১০ মিমি, ৫ মিমির বদলে ২ মিমি করা হচ্ছে। একে লঘু দূরবীন পদ্ধতি বলা হয়। কিছু কেন্দ্রে তো একটি ছিদ্রের সাহায্যে অপারেশন করা হচ্ছে। এখন তো এই অপারেশনের জন্য বিদেশে আরও অতি আধুনিক প্রযুক্তি চালু হয়েছে। একে NOTES (Natural orifice transluminal endoscopic Surgery) বলে। এই প্রক্রিয়াতে শরীরে প্রাকৃতিক ছিদ্রগুলির মাধ্যমে উপকরণ পাঠানো হয় এবং পাথর বের করা হয়। আগামী দিনে ভারতেও এই প্রক্রিয়া শীঘ্র চালু হবে।



নির্মাণকর্মীর মেয়ের নজরকাড়া লড়াই

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ লড়াইটা শুরু হয়েছিল ক্লাস ফাইভ থেকে। সেই থেকে আজও একই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে মালদার মামণি। মামণি ঘোষ। বাড়ি জেলা শহর ইংরেজবাজার থেকে ১৮ কিলোমিটার দূরের একটি প্রত্যন্ত গ্রাম ফুলবাড়িয়ায়। বাবা নির্মাণকর্মী। মা দিনমজুর। সদ্যসমাপ্ত ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট অ্যাথলেটিক মিটে অনুর্ধ্ব আঠেরো (১৮) মহিলা বিভাগে জ্যাভলিন প্রতিযোগিতায় রাজ্যে রেকর্ড গড়েছে মামণি। তার এবারের ছোঁড়া জ্যাভলিন ছুঁয়েছে ৩৪.৮৩ মিটার। এতদিনে দীর্ঘ (প্রায় ৫ বছরের) লড়াইয়ের স্বীকৃতি হিসেবে সবার সামনে বলার মতো একটা ভাষা খুঁজে পেয়েছে মামণি।

দুই দিদি ও এক দাদা-সহ ফুলবাড়িয়ার প্রান্তিক পরিবারের সবার ছোট এই মেয়েটিকে সবথেকে বেশি দারিদ্র্য, ক্ষুধা, বঞ্চনা ও লিঙ্গ বৈষম্যের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে। আর সেই লড়াইয়ে তার একমাত্র হাতিয়ার জ্যাভলিন। এই লড়াই-এর একবারে শুরুর দিকে মামণির কোচ পুলক ঝা (যিনি অ্যাথলিটস্‌দের কাছে মাস্টার নামেই বেশি পরিচিত) তার হাতে তুলে দিয়েছিলেন বর্শা (জ্যাভলিন) নামক সেই ব্রহ্মাস্ত্র। আর মাস্টারের তুলে দেওয়া সেই অস্ত্র তথা জ্যাভলিন দিয়েই মামণি জয় করতে চেয়েছে তার জীবনের সব প্রতিকূলতা, সেই বর্শা দিয়েই নিক্ষেপ করতে চেয়েছে দারিদ্র্য, বঞ্চনা ও হতাশা এবং অবশ্যই ছুঁড়ে ফেলতে চেয়েছে ভবিষ্যৎ জীবনের অনিশ্চয়তাকে বহুদূরে ...৩৪.৮৩ মিটার (রাজ্য রেকর্ড), না আরও দূরে... যাতে করে ওর আগামী দিনে একটি সরকারি চাকরির পথ সুগম হয়। তাই এবার লক্ষ্য জাতীয় স্তরে নিজের জাত বোঝানোর।

মামণি প্রসঙ্গে যার কথা সব থেকে বেশি প্রাসঙ্গিক— যিনি দিনের বেশিরভাগ সময়ে ওর সঙ্গী অর্থাৎ ওর কোচ পুলক ঝা। মামণির কথা বলতেই তিনি বললেন, 'ওর শরীরই ওর সম্পদ। আর সেই সঙ্গে ওর মধ্যে যোগ হয়েছে কিছু করে দেখানোর খিদে।' একটু একটু করেই যেন শান দিয়ে চলেছেন পুলকবাবু।

আমের বাগানঘেরা বিদ্যালয়ের খেলায় মাঠের প্রতিটি সবুজ ঘাসেরা সাক্ষী, তাদের মাঠের এই মেয়ের বড় হয়ে ওঠার গল্প। অপুষ্টি, অনাহারের জ্বালাকে বর্শার ফলায় নিক্ষেপ

অন্য রকম

করার তার প্রাণপণ প্রয়াস। আর এতদিনের সেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, প্রতিদিনের নিষ্ঠা ও প্রয়াসের প্রাথমিক ফল মিলল এবার সল্টলেকে। অবসান ঘটল দীর্ঘ প্রতীক্ষার। যদিও এর আভাস আগেই মিলেছে। জেলা ও রাজ্যস্তরে প্রথম হওয়ার সময়। সেই থেকে 'রেকর্ড হবে'— এই স্বপ্নের বীজ বোনা শুরু। আর ৬৭তম ওপেন স্টেট অ্যাথলেটিক মিটে তার সফল বাস্তবায়ন। বর্শায় বাংলার সেরা— মামণি।

আর মামণি নিজে কী বলে নিজের কথা— কোচ পুলকবাবুর প্রতি অন্তহীন শ্রদ্ধা আর জাতীয় স্তরে নিজেকে প্রতিষ্ঠার লড়াই-ই ওর একমাত্র লক্ষ্য। নতুন স্বপ্ন; সেই স্বপ্নে বিভোর মামণির চোখে চিক্‌চিক্ করছে— জাতীয় রেকর্ড। আমির খানের 'দঙ্গল'-এর সেই গীতার কথা মনে পড়ে। আন্তর্জাতিক স্তরে যখন সে কুস্তিতে প্রতিপক্ষকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল, তখন তার বাবা তথা প্রথম কোচ মহাবীর সিংহ ফোগাতের দেশীয় কৌশল ও হার না মানার মন্ত্র তাকে সবচেয়ে বেশি শক্তি ও সাহস জুগিয়েছিল। মামণিরও তেমনি পুলকবাবুর কিছু গ্রামের পরিবেশের আদলে দেশীয় উদ্ভাবনী কৌশল ও জেতার অদম্য জেদ ওকে জাতীয় স্তরে সাহস ও শক্তি জোগাবে আশা রাখি।

মামণির জীবনে জ্যাভলিন ছাড়াও আছে আরও একটি আকর্ষণ--- ভলিবল। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুনীল কুমার সরকার তাই গর্বের সঙ্গে বলে ওঠেন— 'ভলিবলে মামণির টিম ডিস্ট্রিক্ট চ্যাম্পিয়ন ও টিম লিডার'। যাইহোক, মামণি ওর জ্যাভলিন ভালোবাসে। ওর ভলিবলের ভালোলাগা আমাদের জন্য আরও চমক উপহার দেবে নিঃসন্দেহে। এবং এই দুই নিয়ে আগামীদিনে খেলার জগতে আরও বড় হোক এই প্রার্থনা। ■

‘ইন্দু সরকারের’ ধাক্কায় কাতর কংগ্রেস

শ্রীদীপ বসাক

ঝুলি থেকে বাঘ বেরোবে না বিড়াল, কেউ জানে না। অথচ এখনই কংগ্রেসের মূর্চ্ছা যাওয়ার অবস্থা। উপলক্ষ্য, মধুর ভাণ্ডারকরের নতুন ছবি ইন্দু সরকার।

ভারতে এক শ্রেণীর মানুষ আছেন যারা মনে করেন ছবি তৈরির ব্যাপারটা তারা ঢের ভালো বোঝেন। এমনকী সময়ে সময়ে সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেও তাদের আটকায় না। বাকস্বাধীনতা বা সচেতনতার প্রেক্ষিতে এটা ভালো হলেও তারা যখন সেন্সর বোর্ডের দায়িত্বটাও নিজেদের কাঁধে তুলে নেন তখন সমস্যা বাড়ে। এই ‘স্বঘোষিত’ সেন্সর বোর্ড ঠিক করে দেয় কোন ছবি দেখা উচিত বা কোনটা নয়। কোন দৃশ্য বা সংলাপ বাদ দিতে হবে ইত্যাদি।

পরিচালক মধুর ভাণ্ডারকর সম্প্রতি এমনই সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন। ১৯৭৫-৭৭ ভারতের ইতিহাসে ভয়াবহ সময়। ১৯৭৫ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন। যা চলেছিল ৭৭ পর্যন্ত। মধুরের আগামী ছবি ইন্দু সরকারের বিষয় এই জরুরি অবস্থা এবং ইন্দিরা গান্ধী। এইটুকুতেই সিঁদুরে মেঘ দেখতে শুরু করেছে কংগ্রেস। তাদের দাবি ছবিটি আগে তারা দেখবেন। যদি তারা মনে করেন ছবিতে তাদের নেতাদের সম্বন্ধে আপত্তিকর কিছু দেখানো হয়নি তখনই ছবিটি সেন্সর বোর্ডের অনুমোদনের জন্য পাঠানো যেতে পারে। ছবির রিলিজ (২৮ জুলাই) যাতে পিছিয়ে দেওয়া হয় তার জন্য সারা দেশ জুড়ে গণ্ডগোল শুরু করেছে কংগ্রেস। মুম্বইতে ছবি রিলিজের আগে প্রেস কনফারেন্সও বয়কট করেছে তারা।

এখন প্রশ্ন হলো, ইন্দিরা গান্ধীর জীবন নিয়ে একটি ছবি তৈরি হওয়া মাত্র কংগ্রেস এমন উন্মত্ত হয়ে উঠল কেন?



‘ইন্দু সরকার’ ছবির পোস্টার।

কীসের এত ভয়! আজকের জাতীয় রাজনীতিতে ইন্দিরা গান্ধী মোটেই ততটা প্রাসঙ্গিক নন। সুতরাং জরুরি অবস্থার প্রকৃত প্রেক্ষাপট উন্মোচিত হলেও মৃতপ্রায় জাতীয় দলটির তেমন কোনো ক্ষতি হবে এমনটা কেউই মানছেন না। তাহলে কী উদ্দেশ্যে কংগ্রেস ছবির রিলিজ পিছিয়ে দিতে চাইছে? মুম্বই চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের একাংশের বক্তব্য, কংগ্রেস আসলে সারা দেশে সহানুভূতির হাওয়া তুলতে চাইছে। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী দেশের প্রধানমন্ত্রী হবার পর থেকে কংগ্রেসের অন্তর্জলী যাত্রা শুরু হয়েছে। মধুর ভাণ্ডারকরের ছবির রিলিজ আটকে দেবার দাবি তুলে বিনাশকালে বিপরীতবুদ্ধির আর একটি নমুনা পেশ করল কংগ্রেস।

পরিচালক মধুর ভাণ্ডারকর জানিয়েছেন ছবির সত্তর শতাংশই কাল্পনিক। কিন্তু কংগ্রেসের এখন কল্পনাকেও ভয়। তাদের প্রশ্ন, মধুরের মতো বাণিজ্যিক ধারার পরিচালকেরা কেন ঐতিহাসিক ঘটনা বা ব্যক্তিত্বদের নিয়ে ছবি করছেন? তার জন্য তো তথ্যচিত্র নির্মাতারা রয়েছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মধুর বলেছেন, অতীতের পুনঃসৃজনের মাধ্যমে ইতিহাসের সময়োপযোগী ব্যাখ্যা দেওয়াই তার উদ্দেশ্য। কোনও নেতা বা নেত্রীর চরিত্র বিকৃতি নয়।

অন্যদিকে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের জীবনীভিত্তিক ছবি দ্য অ্যাকসিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার নিয়েও শুরু হয়েছে বিতর্ক। এ ক্ষেত্রেও অশান্তির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে কংগ্রেস। তাদের আশঙ্কা ইউপিএ সরকারের হাজারও কেলেঙ্কারির পর্দা ফাঁস করা হবে এই ছবিতে। কংগ্রেসের রকমসকম দেখে রসিকতার বন্যা বয়ে গেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। শতাব্দীপ্রাচীন দলটিকে কেউ বলেছেন ড্রামা কোম্পানি, আবার কেউ বলেছেন সার্কাস পার্টি। মনমোহন সিংহের ভূমিকায় অভিনয় করবেন অনুপম খের। তাকে আগাম শুভেচ্ছা জানিয়েছে সারা দেশ। ■

পাহাড় ও একটি শিশু

এ এক ছোট্ট শিশুর কথা। চঞ্চল মতির এই শিশু অনর্গল কথা বলে। ছোটাছুটি হুটোপুটি সারাক্ষণ এই তার খেলা। মা অনেক আদর করে তাকে কোলে ধরে রাখতে চায়, কিন্তু সে থাকে

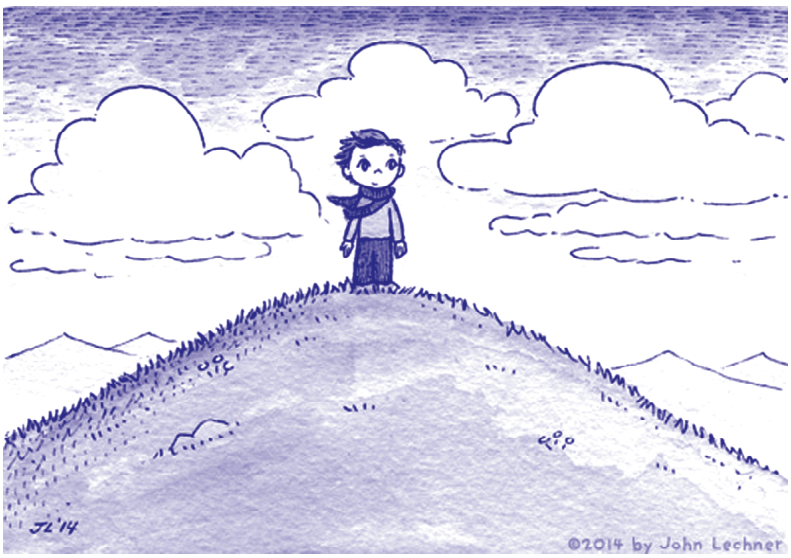

না। মায়ের আঁচল ধরে হাঁটতে ভালোবাসে সে। নানা প্রশ্ন করে মাকে, মা সব প্রশ্নের উত্তর দেয়।

রেলগাড়ি চেপে তারা সবাই মিলে একদিন রওনা দিলো পাহাড় দেখতে। শিশুটির মনে আনন্দ, সে পাহাড় দেখবে। কু-ঝিক-ঝিক করে রেলগাড়ি চলছে পাহাড়ি কোনো স্টেশনের দিকে।

শিশুটি মাকে প্রশ্ন করে— মা, পাহাড় কী রেল গাড়ির মতো?

মা বলে— না, পাহাড় রেলগাড়ির মতো কু-ঝিক-ঝিক করে কথা বলে না। কিন্তু তুমি যদি পাহাড়ের সঙ্গে কথা বল তাহলে সেও তোমার সঙ্গে কথা বলবে।

শিশুটির মনে খুব আনন্দ, পাহাড়ের সঙ্গে সে কথা বলবে।

একদিন পর রেলগাড়ি একটি পাহাড়ি স্টেশনে এসে থামলো। শিশুটি ও তার মা বাবা নেমে পড়লো রেলগাড়ি থেকে। লম্বা হর্ন বাজাতে বাজাতে রেলগাড়িটি পাহাড়ের কোনো বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল। স্টেশনটি পাহাড় ঘেরা উচ্চ কেনো জায়গায়। চারিদিকে উঁচু উঁচু পাহাড়।

শিশুটি ঘাড় উঁচু করে দেখার চেষ্টা করে পাহাড়ের চূড়া। সেই চূড়ায় সাদা সাদা মেঘেদের আনাগোনা।

পথের দু-ধারে কত নাম না জানা গাছ। রঙ বেরঙের ফুল ফুটে আছে। মা শিশুটিকে গাছেদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। কিন্তু শিশুটির তাতে মন নেই। সে চায় পাহাড়ের সঙ্গে কথা বলতে।

দিনের শেষে শিশুটি হাঁটতে হাঁটতে এসে দাঁড়ায় একটি পাহাড়ের নীচে। পাহাড়কে জিজ্ঞেস করে, পাহাড় তোমার ওপারে কী আছে?

পাহাড় কোনো উত্তর দেয় না।

শিশুটি আবার জিজ্ঞেস করে— পাহাড় সূর্যদেব তোমার কে হয়?

পাহাড় নিরুত্তর।

শিশুটি এবার বিরক্ত হয়। চিৎকার করে বলে— তুমি খুব খারাপ।

পাহাড় উত্তর দেয়—তুমি খুব ভালো।

সেই উত্তর চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে বার বার। যেন চারিদিকের সব পাহাড়গুলি একসঙ্গে বলছে, তুমি খুব ভালো, তুমি খুব ভালো।

শিশুটি আনন্দে নেচে ওঠে।

মা তখন শিশুটিকে বলে— তুমি সব সময় অন্যকে ভালো বলবে। তাহলে বাকিরাও তোমাকে ভালো বলবে।

ওরা ফিরে আসে। শিশুটির চোখে এখন শুধুই পাহাড়। বন্ধুদের কাছে পাহাড়ের বর্ণনা দেবার সময় ওর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। পাহাড়ি ঝর্ণা মেঘের রাজ্য থেকে আঁকাবাঁকা পথে কেমন করে নীচে নামে, তার গল্প শুনে বন্ধুরা আনন্দে হাততালি দিয়ে ওঠে। শিশুটি পাহাড়ের ভাষা বোঝে, পাহাড়ের সঙ্গে কথা বলতে পারে এটাও বন্ধুদের কাছে আশ্চর্যের ব্যাপার। তারা পাহাড়ের ভাষা শিখতে চায়। শিশুটির কানে ভেসে আসে পাহাড়ের কণ্ঠস্বর, 'তুমি খুব ভালো।' মনে পড়ে যায় আরও কত অজস্র পাহাড় এই একটি কথার প্রতিধ্বনি তুলেছিল। শিশুটি তার মায়ের কথাগুলোই বলে, 'তোমরা সবাইকে ভালো বলবে। তাহলে তোমাদেরও সবাই ভালো বলবে।'

বন্ধুরা মেনে নেয় শিশুটির কথা। সবাইকে ভালো বলতে শুরু করে। ওরা ভালো বলে, ভালো দেখে, ভালো চিন্তা করে। ধীরে ধীরে পৃথিবীটাই বদলে গেল ওদের। এখন ওরা প্রজাপতির ভাষা বোঝে, গাছের ভাষা বোঝে— পাহাড়ের তো বোঝেই। যখন রাত নামে, দু'চোখের পাতা ঘুমে জড়িয়ে আসে তখন ওরা সবাই শুনতে পায় পাহাড়ের কণ্ঠস্বর, 'তোমরা খুব ভালো, তোমারা খুব ভালো।' আরও ভালো হবার স্বপ্ন দেখতে দেখতে ওরা ঘুমিয়ে পড়ে।

ভারতের পথে পথে

তাওয়াং, অরুণাচল প্রদেশ

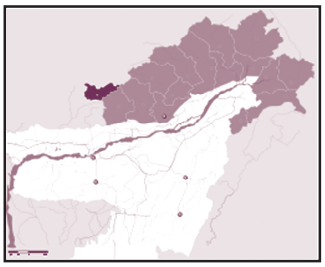

তাওয়াং ভারতের অঙ্গরাজ্য অরুণাচল প্রদেশের একটি জেলা। এখানকার গুম্ফা বিশ্ববিখ্যাত। গুম্ফাটি পঞ্চম দলাই লামা গাওয়াং লবস্যাঙ জিয়াস্টোর অনুরোধে মেরাক লামা লড্রে জিয়াস্টো তৈরি করেছিলেন। এই গুম্ফার রক্ষাণাবেক্ষণ করেন জেলুগপা সম্প্রদায়ের মানুষ। তাওয়াং গুম্ফা ভারতের মধ্যে বৃহত্তম। এমনকী তিব্বতের রাজধানী লাসার বাইরে এত বড়ো গুম্ফা আর কোথাও নেই। এই তাওয়াং জেলাকে ভারতের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার জন্য চীন অনেকদিন ধরে চেষ্টা করছে। চীনের দাবি তাওয়াং তিব্বতের অংশ। অথচ সিমলা চুক্তি অনুযায়ী তাওয়াং ভারতেরই অংশ। তাওয়াং-এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অসাধারণ। ষষ্ঠ দলাই লামার জন্ম এখানে হয়েছিল বলে তাওয়াং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কাছে পবিত্র তীর্থস্থান।

এসো সংস্কৃত শিখি

ভবান্ মম অপেক্ষয়া জ্যেষ্ঠ: কিম্?
তুমি আমার থেকে বড় কি?
অহো, মম অপেক্ষয়া কনিষ্ঠ: কিম্?
তাহলে, আমার থেকে ছোট?
ভবান্ বিবাহিত: কিম্?
তুমি বিবাহিত কি?
নৈব, ইদানীমপি একাকী।
না, এখনও একাই আছি।
ভবত: পিতা কুত্র কার্য করোতি?
তোমার বাবা কোথায় কাজ করেন?

ভালো কথা

এক ছাতায় দুজনে

রোদে স্কুলে গেলে ছাতা নিয়ে যেতে হয় তা কে না জানে। আমাদের স্কুল বাড়ি থেকে বেশ দূর। আমি ও আমার বন্ধু দুজনে ছাতা মাথায় দিয়ে হেঁটে হেঁটে রোজ স্কুলে যাই। একদিন স্কুল ছুটির পর আমার বন্ধুর ছাতাটি খুঁজে পাওয়া গেল না। হারিয়ে গেছে। আমরা অনেক খোঁজাখুজি করলাম, কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না। বাইরে তখন খুব রোদ। আমাদের হেঁটে হেঁটে ফিরতে হবে। তখন একটি ছাতা মাথায় দিয়ে আমরা দুজনে বাড়ি ফিরলাম। সেই থেকে আমরা দুজন একটি ছাতা মাথায় দিয়েই স্কুলে যাই ও স্কুল থেকে ফিরি। এতে আমাদের খুব আনন্দ হয়।

অপর্ণা বর্মন, তুফানগঞ্জ, কোচবিহার।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

শান্তির গ্রাম

অনন্ত সাহা, নবম শ্রেণী

আমাদের ছোট গ্রাম
ভরা গাছে গাছে
দোয়েল ফিঙে চড়ুই পাখি
কিচিমিচি ডাকে।
ভোর হলে মোরগ ডাকে
চাষী মাঠে চলে,
সুর করে পড়ুয়ারা
পড়াশুনা করে।

এক আছে ছোট্ট নদী
ডিঙি ভেসে যায়
বর্ষার মরশুমে
দু-কুল ছাপায়।
মন্দিরে বাজে শাঁখ
সন্ধ্যে আরতি
শান্তির প্রার্থনায়
জ্বলে ঘরে ঘরে বাতি।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। রাসবিহারী বসু।। ৩৪



শব্দরূপ-৮৩৭ শ্যামাপ্রসাদ দাশ

১		২	■	৩		৪	■
	■		■		■		■
৫	৬		■		■		■
■		■	■	৭			
৮			৯	■	■		■
■		■		■	১০	১১	
■		■		■		■	
■	১২			■	১৩		

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. ইলিয়াড, ওডিসি প্রণেতা অন্ধকবি, **৩.** পৃথিবীর বৃহত্তম অরণ্য, **৫.** লোভী, **৭.** সমুদ্র, **৮.** 'হও সবে —', **১০.** সর্পদংশন, **১২.** আহ্লাদিতা, **১৩.** সুকান্তের বিখ্যাত কবিতা।

উপর-নীচ : ১. এর পাতা ঘরের বেড়া তৈরিতে ব্যবহৃত হয়, **২.** উল্লাস, **৩.** নৃত্যের বোল, **৪.** একতারা জাতীয় বাদ্যযন্ত্র, **৬.** ছোটো বড়োর মধ্যে তারতম্য বোধ, **৯.** বৈদিক ঋষি যিনি সশরীরে স্বর্গে যান, **১০.** শুকানো খেজুর, **১১.** শ্রেণী, সারি।

সমাধান : শব্দরূপ-৮৩৫

ক	ল	কা	তা	■	সু	■	গ
■	লি	■	লু	■	কু	চি	লা
মো	তা	বে	ক	■	মা	■	য়
হি	■	■	দা	দু	র	■	গ
ণী	■	কু	র	র	■	■	লা
চৌ	■	ব	■	ব	না	শ্র	য়
ধু	ম্ব	ল	■	গ	■	মি	■
রি	■	য়	■	ম	দ	ক	ল

সঠিক উত্তরদাতা

অভীক সরকার, রায়গঞ্জ
দেবাশিস দাস, ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর

□ ৮৩৭ সংখ্যার সমাধান আগামী ৩ আগস্ট ২০১৭ সংখ্যায়

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. KOL RMS/048/2016-18
31 July - 2017 - Rs. 10.00,

SURYA

Energising Lifestyles

Wide beam angle for better light spread

WHY SURYA LED ?

The Next-Gen Surya LED lighting provides many advantages in terms of

- Eco Friendly
- Instant Lighting
- Low Maintenance
- High Energy Efficiency
- High Power Factor
- Lasts upto 25000 hrs
- Wide Operating Voltage Range*



WARRANTY 2 YEAR WARRANTY
ON ALL LED PRODUCTS

5W MRP ₹350/-

www.surya.co.in









*voltage range 100V - 300V

SURYA ROSHNI LIMITED
Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi - 110008 (INDIA) Tel : +91-11-47108000, 25810093-96,
Fax : +91-11-25789560 E-mail : consumercare@sroshni.com
Call Toll Free No. : 1800-102-5657 Join us on facebook at www.facebook.com/suryaroshni and share your thoughts!

Published and Printed by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6.
Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. ।। দাম ১০ টাকা ।।